তৃতীয় অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম পর্বের উপন্যাস (১৯৯০-১৯৯৯) : জীবন জিজ্ঞাসার ভিন্নস্বর অনুসন্ধান

সময়টা বিশ শতকের শেষ পাদ। রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিচিত্র পালাবদলের ঘটনার সাক্ষী এসময়। সমগ্র বিশ শতকের শেষ দশকে ফিরে তাকালে আমাদের সামনে উঠে আসে একের পর এক বিশ্ব-পরিস্থিতির রূপ বদলের চিত্র। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার মানুষের সামনে বিশ্বকে জানার পথকে উন্মুক্ত করে। ইতিপূর্বে মানুষ ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে পেরেছিল। তবে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার উপর বিশ্ব-মানব যখন ভরসা করতে শিখল তখনই আবার তার ব্যর্থতায় সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গেল। বিশ্ব জুড়ে দেখ দিল বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। ধনতন্ত্রের করাল গ্রাস পৃথিবীর সমগ্র মানব-জাতিকে নিজের গণ্ডির পুতুলে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে এই সময় পর্বেই। মানুষ তার নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি, বিচার ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে কীভাবে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে তা সে নিজে অনুভব করতে পারেনি। নিজের মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ করার পথে অগ্রসর হতে হতে এলো উত্তরউপনিবেশবাদ, উত্তরাধুনিকতাবাদ এবং উত্তরমার্কসবাদ। নীতিবাদ আর আদর্শ নামমাত্র টিকে রইল। সমস্ত কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষ বিভ্রান্তির পথে এগিয়ে গিয়েছিল বিশ শতকের শেষের দশকগুলিতে। 'মুক্ত বিশ্ব বাণিজ্য'-এর দ্বারা বিশ্বের দরবারে সমস্ত পথ উন্মুক্ত হলে মানুষের সামনে বহুমাত্রিক পথ খুলে যায় ঠিকই, কিন্তু আদর্শ নির্বাচনের দ্বিধা তাকে জর্জরিত করে। যা মানুষের জীবন যাত্রার কৌশলে চিহ্ন রেখে যায়।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাস রচনায় পদার্পণ করলেন বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে। নব্বইয়ের দশক মানেই বাবরী মসজিদ ধ্বংস, ধর্মের বেশাতি, যন্ত্রবিজ্ঞানের বিশ্বায়ন, গণমাধ্যমের বাড়বাড়ন্ত, একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভাঙনের শেষ পর্যায়। ফ্ল্যাটজীবনের অভ্যস্ততা, নগরমুখী জীবন যাত্রা, কেন্দ্র এবং রাজ্যের চিরাচরিত দোলাচলতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজ পরিবেশকে নানা রূপে জর্জরিত করে। সব কিছুর মাঝে মানব জীবনের চলমান স্রোত প্রতিনিয়ত মানবজীবনের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে । ফলে মানুষ নতুন নতুন ভাবে জীবনকে অনুভব করে। সময়-সমাজ মানুষের জীবনে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আনতে বাধ্য। তাই জীবন তার নিজের ছন্দকে পছন্দ করে নেয়। এই ভাবে চলতে চলতেই একদিন মানুষের নৈতিকতার পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তন ব্যক্তিচরিত্রকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যায় সেই কাহিনি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম পর্বের উপন্যাসের মধ্যে উঠে এসেছে।

তাঁর উপন্যাস রচনায় লক্ষ করা যায় ষাট-সত্তরের উত্তাল সময়ের ইতিবৃত্ত। সাধারণ মানুষগুলি সময় পরিস্থিতির চাপে তাদের দৈনিক জীবন-যাত্রায় কীভাবে রোজ পরিবর্তন হচ্ছে তার কাহিনি। নবনির্মিত সমাজের বিশ্বায়ন (Globalization) মানুষের চরিত্রের ভিত্তিমূলে প্রবেশ করে আচরণগত পরিবর্তন ঘটায়। সেই পরিবর্তনই প্রথম পর্বের উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা দেখা গেছে। উপরন্তু তাঁর উপন্যাসের মূলে সমাজ গবেষণার একাটা বড় অংশ যা তাঁর নির্মাণ কৌশলে স্থান পায়। 'চতুষ্পাঠী', 'নবমপর্ব', 'বাস্তুকথা' উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তী যেভাবে জীবন-চর্যাকে তুলে ধরেছেন এবং চরিত্রগুলির কথায় যে জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরেছেন তার পরিচয় নেওয়া যাক।

এপর্বে কিছু ছিন্নমূল মানুষের শিকড় ছেঁড়ার কাহিনিও লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই মানুষগুলি যে নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না সেই চিত্র উঠে এসেছে বহু জায়গায় বহু বাঁকে। ১৯৯০-১৯৯৯ সময়পর্বে লেখা উপন্যাসগুলি হল— ১. 'চতুষ্পাঠী' ২. 'নবমপর্ব' ৩. 'বাস্তুকথা'। ক্রমপর্যায়ে উপন্যাসগুলির মধ্যেকার জীবন জিজ্ঞাসার নানান স্বর অন্বেষণে অগ্রসর হলাম।

১

'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসটি ১৯৯২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার 'শারদীয় সংখ্যায়' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৫ সালে জানুয়ারি মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল পাঠক মহলে। উপন্যাসের পটভূমি বিশ শতকের ষাটের দশক। অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অনঙ্গমোহনবাবুর সংস্কৃতভাষার প্রতি প্রেম এবং সেই ভাষাকে টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের গল্প এই উপন্যাসের কাহিনি বস্তু। দেশভাগের পর অনঙ্গমোহন এপার বাংলায় চলে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন পিতার সংস্কৃত টোল অর্থাৎ 'চতুষ্পাঠী'কে। তিনি পরিবার প্রতিপালন করতেন এই টোলের ওপর ভিত্তি করেই, সরকারি বৃত্তিই যার অবলম্বন। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কদর কতটা তা কিছুদিনের মধ্যেই অনঙ্গমোহন বুঝতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কার এবং পিতৃসত্য পালনের তাগিদ তাঁকে আবদ্ধ করে রাখে। পুত্র জগদীশ দুই সন্তান বিলু, স্বপ্না আর স্ত্রী অঞ্জলিকে রেখে মারা যায়। সংসারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অনঙ্গমোহনের কাঁধে এসে পড়ে। চতুষ্পাঠীতে অবৈতনিক পাঠদান করেন অনঙ্গমোহন। ফলে আর্থিক অনটন কোনমতেই তাঁর পিছু ছাড়ে না। জগদীশের মৃত্যুর পর জগদীশের অফিসে কাজে যোগ দেয় অঞ্জলি। হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনঙ্গমোহন পুত্রবধূকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে বাধ্য হন। বর্তমান দশকের মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি গ্রাহ্য না করলেও

প্রতি পদে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আসলে নতুন প্রজন্ম সংস্কৃত শিক্ষাকে আর আমল দিতে চায় না। কারণ স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষকদেরও ইংরেজিটা শিখতে হয়। ফলে ইংরেজি হয়ে যায় কর্মসংস্থানের ভাষা। পরিবর্তিত নতুন সমাজের তাগিদ লক্ষ্য করেন অনঙ্গমোহন। কিন্তু অতি সংস্কৃতানুরাগের বশে তিনি তাঁর 'চতুষ্পাঠী'কে বিসর্জন দিতে পারেন না। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আস্থা, তাঁর তৃপ্তি। সংসারের অচল অবস্থায় ভিন্নবৃত্তিও ধারণ করেন অনঙ্গমোহন। কিন্তু চতুষ্পাঠীর কয়েকটি ছাত্রের প্রতি তাঁর অসীম আগ্রহ। চতুষ্পাঠীর এক মাত্র উজ্জ্বল ছাত্রী সুমিতা অতি শীঘ্র উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। তাই সুমিতাকে নিজের সন্তানের স্নেহে সমস্ত রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অনঙ্গমোহন। এমনকি, বিবাহের জন্য সুপাত্রের ব্যবস্থাও তিনিই করেন। এহেন সুমিতার বিবাহে অনঙ্গমোহন উপহার স্বরূপ 'নৈষধচরিত' গ্রন্থটি প্রদান করেন নিজ হস্তাক্ষর সংযুক্ত করে। অনঙ্গমোহনের হৃদয়ে এই ধারণা ছিল যে— তাঁর চতুষ্পাঠীর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সুমিতাই তাঁর মান রাখবে। কিন্তু ঠোঙার ব্যবসায় অর্থ উপার্জন বেশি না হওয়ায় তিনি নিজের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বিক্রি করে দিতে কলেজ স্ট্রিটে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি প্রথম বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তিনি দেখেন সুমিতাকে দেওয়া তাঁর উপহারটি কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে এক কলেজ ছাত্রের হাতে। সাময়িকভাবে এতদিনের সংস্কৃত নিয়ে তাঁর গর্বের প্রাণস্ফূরণ ম্লান হতে গিয়েও অনঙ্গমোহন মনে করেন সংস্কৃত ভাষা মরবে না; তা অন্য সুমিতাদের হাতে শোভা পাবে, পড়বে, গবেষণা করবে। দরিদ্র ব্যক্তি বিদ্যাকে সঙ্গে নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। তার প্রমাণ অনঙ্গমোহনের ঠোঙা ফেরি করা পৌত্র বিলু। সংসারকে বাঁচানোর তাগিদে পৌত্রী স্বপ্নাকে বিবাহ দেন অব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে। তিনি জানেন এই বিবাহ 'প্রতিলোম' বিবাহ। কিন্তু এই উদ্বাস্তু, অন্নহীন সংসারে যৌবনকে তিনি বাঁচাতে পারবেন না। তাই অনিচ্ছাকে মেনে নিয়ে তিনি এগোন। কারণ তাঁর পরিবার প্রবল সংকটের মুখে। যুদ্ধের বাজারে তাদের অভাব। বিলু চায়ের দোকান করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ অঞ্জলির চাকরি চলে যায়। অনঙ্গমোহন দ্বিধায় পড়ে যান। এতদিনে অনঙ্গমোহন বুভুক্ষু থেকেও ছাত্রদের বিদ্যাদান করে এসেছেন। কিন্তু পরিবারের পাশে আজ তাঁকে দাঁড়াতে হবে। সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি শঙ্কিত হলেও বর্তমানের দাবিকে অস্বীকার করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাই নাতি বিলুকে তিনি নতুন যুগের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হতে বলেন। এতদিনের সংস্কৃত চর্চা যে গ্রন্থগুলি থেকে তিনি অর্জন করেছেন সেই গ্রন্থগুলি ছিঁড়ে গ্রাহকদের বিস্কুট, কেক দেওয়ার মনস্থ করেন। আসলে কঠোর সংস্কৃতভাবী মন নিয়ে বর্তমান সমাজের সঙ্গে চলা যায় না, পরিবারকে রক্ষা করা যায় না। এই উপলব্ধি থেকে

অনঙ্গমোহন বর্তমান সমাজের সঙ্গেই মানিয়ে চলতে পা বাড়ান।

'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসের মূল কাহিনি-বস্তু যদি বলা যায় তবে এটুকুই। কিন্তু উপন্যাসটির ভিতরে রয়েছে তথ্যভাণ্ডার। আসলে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রথম উপন্যাস লিখতে বসেছেন। ফলে তাঁর এত দিনের সঞ্চিত রসদ সম্পূর্ণ এই উপন্যাসে ঢেলে দিয়েছেন। উপন্যাসটি নব্বইয়ের দশকে রচিত হলেও এর পটভূমি ষাটের দশক। উপন্যাসটিতে অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্যের মানসিক উত্তরণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অনঙ্গমোহনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বিলু, স্বপ্না, অঞ্জলি, অসীম, বোবাঠাকুর, কামাখ্যা পুরোহিত এবং সুমিতার জীবন বৃত্তান্ত। প্রতিটি চরিত্র সময়ের সঙ্গে চলার জন্য লড়াইয়ে নেমেছে। সময়ের সঙ্গে টিকে থাকতে চায় প্রতিটি মানুষই। কিন্তু ক'জন পারে ভালোভাবে বাঁচতে? সংস্কার, নীতি এসব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কতটা বহন করতে পারে? এই উপন্যাসে মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। 'চতুষ্পাঠী' অর্থাৎ 'টোল' যেখানে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য-অলঙ্কার-ব্যাকরণ চর্চা করা হয়। অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে 'চতুষ্পাঠী'র মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দানের সঙ্গে তাঁর সংস্কৃত ভাষার প্রতি মোহময় হৃদয়ের চিত্র উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। অনঙ্গমোহনের পিতা নীলকমল ভট্টাচার্যও চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ছিলেন পূর্ববঙ্গে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী'টিই বর্তমানে অনঙ্গমোহন চালাচ্ছেন। পিতার কাছ থেকেই তিনি শিক্ষা পেয়েছেন এবং সংস্কৃতকে ভালোবাসতে শিখেছেন। তিনি বুঝেছেন সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই রয়েছে সমস্ত কিছুর রহস্য। তাই সংস্কৃত প্রীতি অনঙ্গমোহনের জীবনাদর্শে সব কিছুর ঊর্ধ্বে। পিতার 'চতুষ্পাঠী' উত্তরাধিকার সূত্রে অনঙ্গমোহনের। কিন্তু চতুষ্পাঠীতে পড়ার চাহিদা ইংরেজি শিক্ষার প্রবহমানতায় ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ইতিমধ্যে ঘটে যায় দেশভাগের মত ঘটনা। ফলে অনঙ্গমোহনকেও হতে হয় উদ্বাস্তু। ভিটে, মাটি এবং টোলের পরিপূর্ণ রূপকে ছেড়ে অনঙ্গমোহন হয়ে পড়েন কলকাতার বাগবাজারের কলোনি বাসিন্দা। কলোনি জীবনে এসেও তিনি ত্যাগ করেননি টোলকে। পুত্র জগদীশকে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাও দিয়েছিলেন। ফলে সে চাকরি জোগাড় করে নিয়েছিল মিষ্টির টিন তৈরির কারখানায়। অনঙ্গমোহন টোলের জন্য সরকারি বৃত্তি পেতেন এবং জগদীশের সামান্য রোজগার— এ দিয়েই তাদের সংসার চলে যেত। জগদীশের বিয়ের পর অনঙ্গমোহনের পরিবার বড় হয়। একে একে স্বপ্না ও বিলুর জন্ম হয় এবং তাদের বড় করার তাগিদে জগদীশ পরিশ্রমী হয়ে ওঠে। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে টিউশনিও করতে থাকে সে। প্রতিনিয়ত অনিয়মের ফলে শারীরিক বিপর্যয় ঘটতে থাকে তাঁর। এক সময় চিকিৎসা করানোর টাকার যোগান না থাকায় হাতুড়ে ডাক্তারদের

ভরসায় জগদীশের দিন কাটতে থাকে। কিন্তু বেশিদিন সে আর লড়াই চালাতে পারে না। একে মন্দার বাজার, তার ওপর জগদীশের মৃত্যু অনঙ্গমোহনকে অসহায় করে তোলে। স্ত্রী সুরবালার মৃত্যুর পর তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তার উপর পুত্রের মৃত্যু তাঁকে আরো অসহায় করে দেয়। জীবন সম্পর্কে অনঙ্গমোহন অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। জীবনের নিয়ম তো এটাই যে— সে কাউকে সময় মতো সুযোগ দেয় না। জীবন যে অনিত্য তা তিনি অনুভব করেন। অনেক কিছুই আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটে না। পরিবর্তনশীল সমাজের দিকে তাকিয়ে উদ্বাস্তু অনঙ্গমোহন পুত্রবধূ অঞ্জলিকে পুরুষশাসিত সমাজে কর্মসংস্থানের জন্য ছাড়তে বাধ্য হন, তা না হলে পরিবারের আগামী প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখা কঠিন। তাই তিনি নিজেকে সংযমী করে বলেন—

> *"... পরিবর্তনশীল জগতের যোগ্য হও। নচেৎ বাঁচব না। সংশয় ত্যাগ কর। ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রানি পশ্যতি। সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি। সংশয় অতিক্রম না কইরা কেউ মঙ্গল দেখতে পায় না। সংশয়ের মধ্যে বাঁইচ্যা থাকলেই সে মঙ্গলরে দেখতে পাবে। সুতরাং তুমি অন্নপূর্ণা হও, বৌমা, বৌমা গো।''*[১]

অঞ্জলির কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গমোহনও চতুষ্পাঠীতে ছাত্র বৃদ্ধির পরিকল্পনা করতে থাকেন। কারণ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা অবৈতনিক। ফলে সরকারের বৃত্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। উপরন্তু সরকার নতুন করে ডি.এ. ঘোষণা করায় অনঙ্গমোহন সেই টাকা পাওয়ার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা দরকার তাই করতে উদগ্রীব হন। কারণ আচার্য হিসেবে সংস্কৃত শিক্ষা দান ছাড়া তিনি অন্য কিছুই পারেন না। বিলু আর স্বপ্নার ভবিষ্যৎ যাতে অন্ধকারে ডুবে না যায় সে দিকে লক্ষ রেখেই অনঙ্গমোহন অঞ্জলিকে কাজের জন্য বাইরে পাঠাতে রাজি হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন কুলবধূদের অন্তঃপুরে রাখার ধারণা সঙ্গত নয়। কারণ তিনি পুরাকালের নারীদের সম্পর্কে জানেন যারা বুদ্ধিমতী এবং কর্মদক্ষ বিদ্বান, উপরন্তু নিজের স্ত্রী সুরবালার জীবন সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। সুরবালার পড়বার ইচ্ছে থাকলেও তাকে পড়ানোর পথে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে; অনঙ্গমোহনের পিতাকে রাজি করিয়ে সুরবালাকে শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করা হলেও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তার আগ্রহ ছিল। কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের কড়া নজর এড়াতে না পারায় সুরবালা সমস্ত শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দেয়। সেসময় থেকেই অনঙ্গমোহন স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং পুত্রবধূ নির্বাচন করার সময় তিনি খুশি হন এই ভেবে যে অঞ্জলি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়াশুনো করেছে। জীবনের বাঁক বদলে যে শিক্ষার

প্রয়োজন রয়েছে তা অনঙ্গমোহন অনুভব করেছেন। তিনি জানেন—

> *"কুলবধূ যে অন্তঃপুরেই থাকবেন এমন নিয়ম কৃত্রিম। পুরাকালে মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, গার্গী এমন আরও কত কুলবধূ জ্ঞান ও মেধার চর্চা করেছেন, পণ্ডিত সভায় গিয়েছেন, কুলবধূদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখা যাবনিক পর্দাপ্রথারই প্রভাব। এবার পেটে হাত দেন অনঙ্গমোহন। রুমালটার অস্তিত্ব অনুভব করেন।"*[২]

অনঙ্গমোহন অনুভব করেন সময় নিয়ত ধাবমান। জীবনের নানা পরিবর্তন হয়ে চলবে এই ধাবমান সময়কে কেন্দ্র করে। অবগুণ্ঠনাবৃতা অঞ্জলি পুরুষশাসিত পরিমণ্ডলে চাকরি করতে যাবে। সেই সূত্রে তার কিছু পরিবর্তন ঘটবেই একথা অনঙ্গমোহন অনুমান করেন। ফলে ধীরে ধীরে অঞ্জলির বেশভূষা, কথাবার্তা, আচরণের পরিবর্তন অনঙ্গমোহন লক্ষ করলেও সে বিষয়ে তিনি কোনো কথাই উচ্চারণ করেননি। অঞ্জলি চাকরি করতে বাড়ির বাইরে বের হওয়ার চিত্র উদ্বাস্তু নারীদের কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের ইতিহাসকে মনে করায়। যা সামাজিক রূপ বদলের চিত্রকে বহন করে।

লড়াই ছাড়া জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা যায় না। তাই তিনিও লড়াইয়ে নেমে পড়েন। তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ থেকে বর্তমানে ষাটের দশকের মধ্য দিয়ে অনঙ্গমোহনের জীবন অতিবাহিত হয়ে চলেছে। এই সময়ে চতুষ্পাঠীতে পড়ার আগ্রহ কারুর মধ্যে তেমন আর অবশিষ্ট নেই। তবুও অনঙ্গমোহনের সংস্কৃত প্রীতি সে পথকে ধরেই বাঁচতে চায়। সরকারী সংস্কৃত-কর্মচারীর নির্দেশ অনুসারে চতুষ্পাঠীতে পাঁচটি ছাত্র উপস্থিত থেকে নিয়মিত পড়াশুনা এবং উপাধি পরীক্ষার জন্য বসলে চতুষ্পাঠীটি মাসে ৪০ টাকা বৃত্তি পাবে। ফলে অনঙ্গমোহনবাবু সেই লক্ষ পূরণের জন্য লড়াই করে চলেছেন। তাঁর টোলে জীবন ডাক্তার, অসীম, সুমিতা এবং বিলু এই নিয়ে মোট চার জন ছাত্র রয়েছে। তাঁর প্রয়োজন পাঁচজন ছাত্রের। নইলে মহার্ঘ ভাতা পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে শুধুমাত্র নাম তোলার খাতিরেই তিনি পৌত্রী স্বপ্নাকে ভর্তি করে নেন তাঁর টোলে। কিন্তু স্বপ্নার সংস্কৃতের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। বাকিদের মধ্যে অসীমের যে খুব আগ্রহ রয়েছে তা নয়। আসলে বাকি চারজনের মধ্যে যদি কম আগ্রহ থাকে তবে অসীমেরই। সে বর্তমান দশকের কিশোর বয়সের ছাপ বহন করা চরিত্র। শুধুমাত্র পিসেমশায় অনঙ্গমোহনের জোর জবরদস্তি তাকে আটকে রাখার চেষ্টায় রয়েছে। উপরন্তু সংস্কৃত শিক্ষা অবৈতনিক এবং গুরুগৃহে থেকে পড়াই কর্তব্য। অসীমের ক্ষেত্রেই সে নিয়ম প্রযোজ্য। কারণ অসীমের বাবা বোবাঠাকুরকে তিনি কথা দিয়েছিলেন, যে—

অসীমকে তিনি মানুষ করবেন। অসীমও গুরুগৃহে থেকে সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে নিয়মিত স্কুল শিক্ষাও গ্রহণ করছে বিলুর সঙ্গে। অনঙ্গমোহনের ইচ্ছা অসীমকে তিনি 'কাব্যতীর্থ' তৈরি করবেন এবং পরবর্তীকালে সে-ই হবে অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠীর উত্তরাধিকারী। অনঙ্গমোহন মনে করেন পৌত্র বিলুকে দিয়ে একাজ সম্ভব নয়। তাকে সময়ের সঙ্গে অভিযোজন করা শিখতে হবে। উপরন্তু অঞ্জলিও বিলুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন। জীবন ডাক্তার জানেন— সংস্কৃত ভাষার মধ্যে রত্ন ভাণ্ডার রয়েছে। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত শিক্ষা নিতে অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হয়েছেন। অনঙ্গমোহনের টোলের কৃতী ছাত্র সুমিতা চক্রবর্তী। সে উপাধি পরীক্ষায় আগামী দিনে বসতে চলেছে। সুমিতা টোলের সব থেকে গুণী এবং কৃতি ছাত্রী। সে সংস্কৃত ভাষাকে এবং অনঙ্গমোহনের দান করা বিদ্যাকে আত্মস্থ করে নিতে সক্ষম। সুমিতা আধুনিক সময়ের নারী। বয়স তিরিশোর্ধ। সে চার বোনের মধ্যে বড়, সে পিতৃহীনা। অভাবের সংসার তাদের। তবে সে সময়ের সঙ্গে চলতে পছন্দ করে। তার আয়ত্তের মধ্যে আসা সমস্তরকম শিক্ষাই সে গ্রহণ করতে চায়। অনঙ্গমোহনবাবুদের ভাড়াবাড়ির আর এক ভাড়াটে অজিতবাবু। তার কাছেই সুমিতা গান শিখতে আসত। সেখান থেকেই অবৈতনিক সংস্কৃত শিক্ষায় তার যোগদান। এই চার ছাত্রই অনঙ্গমোহনের সম্বল। তবে সুমিতার প্রতি অনঙ্গমোহনের আস্থা সর্বাধিক। কারণ আধুনিক নারী হয়েও সে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। ফলে অনঙ্গমোহন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন সংস্কৃত ভাষা কোনো দিনই লুপ্ত হয়ে যাবে না। অনঙ্গমোহনের আচার্য সত্তাটি টিকে থাকে সুমিতার মতো ছাত্রীর আশায়।

সময় ক্রমশ ধাবমান। নিজেকে টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে অনঙ্গমোহনও এসে পড়েছেন ১৯৬৫ সালের কঠিন পরিস্থিতিতে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধকালীন অবস্থা। যুদ্ধের নমুনা অনঙ্গমোহন চাক্ষুস করেছেন। ব্ল্যাক আউটের মধ্য দিয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছে। চারিদিকে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। অনঙ্গমোহনের পরিবার কোন দিকে যাত্রা করে সেটা এবার দেখার। অঞ্জলির চাকরিটা যেতে বসেছে। এক চরম সংকটের মুখোমুখি অনঙ্গমোহনের পরিবার। এরই মাঝে ঔপন্যাসিক চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেছেন। পাঠকের পরিচয় হয় আর এক অনঙ্গমোহনের সঙ্গে। আসলে কঠিন পরিস্থিতিতে অনেকেই নীতি বর্জন করেছেন। কিন্তু অনঙ্গমোহন সে দলের নন। কৃচ্ছ্রসাধন করা তাঁর অভ্যাস। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত পণ্ডিতদের তিনি গুরুত্ব দেন না। তিনি মনে করেন তারা প্রকৃত সংস্কৃত পণ্ডিত নন। কারণ তারা আয়াসে জীবন অতিবাহিত করেন। অনঙ্গমোহনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কামাখ্যা পুরোহিতের জীবন। কারণ কামাখ্যা পুরোহিতের নির্মিত মন্দিরের জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে আনঙ্গমোহনের স্ত্রীর মৃত্যু জড়িয়ে রয়েছে। এই

প্রেক্ষিতে অনঙ্গমোহনের চরিত্রের আরও গভীরে পাঠকের অনুপ্রবেশ ঘটে। বিলুর জন্য সুরবালার কামাখ্যা পুরোহিতের মা কালীর মন্দিরে মানসিক ছিল জোড়া পাঁঠা দেওয়ার। নির্দিষ্ট দিনে জোড়া পাঁঠা নিয়ে উপস্থিত হয়ে নির্বিঘ্নে পুজো সমাপন হওয়ার পর বলি পর্বে ঘটে মূল বিপর্যয়। মা কালী একবারে বলি গ্রহণ করলেন না। অর্থাৎ এক কোপে পাঁঠার মাথা ধড় থেকে ছিন্ন করা না গেলে সে বলি গৃহীত হয় না। পুনরায় বলি দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সঙ্গে যে পরিবারের বলি মা গ্রহণ করলেন না সে পরিবারের অনিষ্ট নেমে আসে। মায়ের জাগ্রত হওয়ার ওপর নির্ভর করে সেই পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি। অনঙ্গমোহনের পরিবারের দীর্ঘদিন কোনো ক্ষতি সাধন না হওয়ায় কামাখ্যা পুরোহিতের মন্দিরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। মন্দিরের প্রণামী বাক্স তার প্রমাণ। মন্দিরের মা জাগ্রত হলে যে কোনো কারুর উপর দিয়েই অনিষ্ট হতে পারত। এমনকি, মন্দিরের কর্মচারী কালাচাঁদেরও কিছু হতে পারত। কিন্তু মন্দিরের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদ পোস্ট অফিসের চাকরি পেয়ে যায়। কামাখ্যাচরণের ছোট ছেলে মানিক মা কালীর ওপর ভরসা না পেয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিসে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে আসে। অন্যদিকে কামাখ্যাচরণ দিনরাত মা কালীর জাগ্রত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তিনি কামনা করে, আনঙ্গমোহনের পরিবারের কারুর কিছু যখন হল না তখন বিপদটা নিজের পরিবারের উপর দিয়েই হয়ে যাক্। আসলে তিনি ধর্মকে ব্যবসার জায়গায় বসিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষাকে সে পথেই চালিত করতে চেয়েছিলেন। ফলে কিছু একটা প্রচার না করতে পারলে চিরাচরিত মানুষকে বোকা বানানোর পদ্ধতিতে ভাটা পড়তে পারে এই আশঙ্কা তার। ইতিমধ্যে অনঙ্গমোহনের স্ত্রী সুরবালার মৃত্যু হয়। তিনি খালধারে মানকচু গাছ তুলতে গিয়ে কোনো কারণে পড়ে গিয়ে মারা যান। কামাখ্যাচরণ হাতের তাস পেয়ে যায়। সুরবালার মৃত্যুকেই দেবীর জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে প্রচার করতে থাকে মৃত্যুর রহস্য। লেখক বর্ণনা করেছেন—

> *"যেদিন সুরবালা মারা গেলেন, সেদিন ভোরবেলা পেচ্ছাপ করতে উঠে মানিকই একবার নাকি মন্দিরে উঁকি দিয়েছিল এবং দেখেছিল, কালীর মুখে যেন রক্ত লেগে আছে।"*[৩]

আনঙ্গমোহন সবটা বুঝতে পারেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না। বিলুর ছ'বছর বয়সে তার ঠাকুমা মারা যায়। আর আজ বিলু ক্লাস সিক্সের ছাত্র। এই ছ'বছরে কামাখ্যা পুরোহিতের মন্দিরে পসার বৃদ্ধি হয়েছে। মায়ের মন্দির পাকা হয়েছে। মন্দিরের চূড়া নির্মিত হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের বছর। দুর্গাপূজার দশমীর দিনে মন্দির চূড়ায় ঘটস্থাপন করবেন কামাখ্যাচরণ। ফলে নিজের প্রতিষ্ঠিত

মন্দিরেই তাঁর সময় চলে যাবে। তিনি এসেছেন অনঙ্গমোহনের কাছে। একদিকে নিজের কার্যসিদ্ধি অন্যদিকে অনঙ্গমোহনের কষ্টের দিনে কিছুটা সাহায্য করা হবে এই ভেবে। কামাখ্যাচরণ চান অনঙ্গমোহন দুর্গা পূজার সময় তন্ত্রধারকের কাজটি করবেন। যে কাজটি এতদিন কামাখ্যাচরণের ছোট ছেলে মানিক করে এসেছে। আজ অনঙ্গমোহনকে দিয়ে সে কাজ করাতে চান কামাখ্যাচরণ। কারণ, অনঙ্গমোহন নির্ভুল সংস্কৃত উচ্চারণ করেন। কিন্তু অনঙ্গমোহন যজমানি বৃত্তি করতে নারাজ। তার উপর পূজা-অর্চনা তার আরও অপছন্দ। সবার সামনে এক অহমিকার রাজ্যে বাস করেন অনঙ্গমোহন। পরিবারের কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল। অন্যদিকে কামাখ্যাচরণ সময়ের সঙ্গে নিজেকে অভিযোজন করতে শিখেছেন। কোন্ পথে উপার্জন সম্ভব সবসময় সে কথাই তিনি ভাবেন। সময়ের সঙ্গে তিনি নিজের বেশ-ভূষাও পাল্টে ফেলেছেন। কথা বলায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে শিখেছেন। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে তিনি নিজেকে স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। ঠিক যেন অনঙ্গমোহনের বিপরীত চরিত্র। যতটা সৎ থেকে অনঙ্গমোহন চলা পছন্দ করেন ঠিক ততটাই অসৎপথে লোক ঠকিয়ে কামাখ্যাচরণ আখের গোছাতে সচেতন। যেন যুগ মানসিকতার পরিবর্তনের এক ঝলক কামাখ্যা পুরোহিতের ব্যক্তিত্ব। অনঙ্গমোহনের তন্ত্রধারী না হতে চাওয়া পুত্রবধূ অঞ্জলি ভালোভাবে নেয় না। কারণ অসীমের গ্রাসাচ্ছাদনের ভারটাও তাকে বইতে হয়। অনঙ্গমোহন নিরুপায়। তিনি কিছুতেই ঈশ্বরের পুজোর দুটো মন্ত্র উচ্চারণ করে ভিক্ষার ঝুলিটি ধরে উপার্জন করতে পারবেন না। কারণ তিনি শাস্ত্রের মূল বার্তা বুঝেছেন। ঈশ্বর নিরাকার, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনায় তাকে পাওয়া যায় না। তিনি জানেন ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে পূজা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজ। কোনো গৃহস্থের বাড়িতে পুজো করে মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করে ঘটের মধ্যে তাঁকে স্থাপন করা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। ফলে দেবদেবীর পূজা করে অর্থ উপার্জনে তার মন সায় দেয় না। তিনি ভাবেন—

> *"ভাবতেছি, কেবলমাত্র পয়সার জন্য, দক্ষিণার জন্য, কাপড়ের জন্য, চাউলের জন্য, ফলফলাদির জন্য আমি ভুল শিক্ষা দিমু? ভাগবান তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রার ঊর্ধ্বে।"*[৪]

অনঙ্গমোহন আহ্নিক করেন, নিজ গৃহে পূজাও করেন। কিন্তু তিনি এটাও বিশ্বাস করেন এই অভ্যাস তাঁর জীবনাচরণের অভ্যাস। নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত। সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনঙ্গমোহনের একটা দায়বদ্ধতা আছে, একটা অনুকম্পা আছে। তিনি জানেন, দিন দিন সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। এটাও সত্য যে সংস্কৃত ভাষাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে বর্তমান পরিস্থিতির

সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু নিরুপায়ের মতো তিনি কামাখ্যাচরণকে বলেন—

> *"আসলে বড় অসহায় আমরা। সংস্কৃত ভিন্ন আর কিছুই জানি না আমরা। সংস্কৃত আমাগোর বৃদ্ধ মাতা। এই মা আর আমাগরে খাওয়াইতে পরাইতে পারে না। তবু আমরা তাঁরে আঁকড়াইয়া ধইরা আছি। আমরা বস্তুবিদ্যা জানি না। তুমি পূজা পদ্ধতি জান, অঙ্গন্যাস করন্যাস জান। জলসুদ্ধি আসনশুদ্ধি জান, আর মানুষ, আমার দ্যাশের মানুষ অল্পবুদ্ধি, সেই হেতু তুমি ফর্দমালা দাও, তোমার গ্রাসাচ্ছাদন হয়। আর আমি?'*[৭৫]

অনঙ্গমোহনের প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই খুঁজেছেন। তিনি জানেন লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাপ্রদান ছাড়া আর কিছুই তার জানা নেই। একমাত্র চতুষ্পাঠীই তার ভরসা। আর ভরসা চতুষ্পাঠীর পাঁচটি ছাত্রের উপস্থিতি দেখিয়ে সরকারি মহার্ঘ ভাতা পাওয়া। তিনি চাইলেই স্কুলের ছাত্রদের সংস্কৃত টিউশনি পড়াতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের অহমিকায় বাধে। কারণ তিনি মানেন সংস্কৃত শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত। সেখানে দাঁড়িয়ে অর্থকষ্টে তিনি সংস্কৃত পড়িয়ে হাত পেতে টাকা নিতে পারবেন না। ফলে চতুষ্পাঠী ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। তিনি বোঝেন— সুমিতার মতো সংস্কৃত মনস্কা ছাত্রী তিনি পাবেন না। তিনি এও অনুভব করেন— সংস্কৃতের শিক্ষা এই যুগে দাঁড়িয়ে যুগমানসের সঙ্গে সাজুয্য রক্ষা করে না। তাই যুদ্ধের বাজারে, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কামাখ্যাচরণের প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া তার গতি নেই। পুরোহিতের বেশে নিজেকে দেখতে অনঙ্গমোহনের অহংবোধে লাগে। ফলে সংসারের হাল ধরতে তিনি ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। বাইরের ব্ল্যাক আউটের রাতে অনঙ্গমোহনের মনেও অন্ধকার নেমে আসে। তবে এ অন্ধকার অবশ্য তাঁর জীবনের নতুন পথ আবিষ্কারের অন্ধকার।

ব্যক্তি বিশেষে জীবন-যুদ্ধে চাহিদার পার্থক্য ঘটে। কামাখ্যাচরণের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন আনঙ্গমোহনের চোখে পড়ে। তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য পৌরোহিত্যের সঙ্গে চতুষ্পাঠীর শিক্ষক, জ্যোতিষ শাস্ত্রচর্চা করে জ্যোতিষীও হয়েছেন। কারণ তিনি বুঝেছেন শাস্ত্রের নামে মানুষকে ঠকানো যায় এবং অর্থও উপার্জন হয়। অনঙ্গমোহনের চোখে কামাখ্যাচরণ ধনলোভী এবং অধম হতেই পারেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অভিযোজনে কামাখ্যাচরণই এগিয়ে। তিনি বুঝেছেন সমাজ ধনীলোককেই সম্মান করে। ফলে এ যাত্রায় কামাখ্যাচরণের চরিত্র অনঙ্গমোহনের অন্তর্জগতকে আরও পরিস্ফুট করে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় পরিস্থিতি বদলের চিত্র সবার চক্ষুগোচর। অনঙ্গমোহনও চেষ্টা করেছে কী করে তার চতুষ্পাঠীটিকে টিকিয়ে রাখা যায়। সুমিতা অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠীর

একমাত্র ভরসা। অজিতবাবুর সঙ্গে সুমিতার চরিত্র স্খলন লক্ষ করেও অনঙ্গমোহন পেটের তাগিদে সুমিতার গরহাজিরার কারণ জানতে তার বাড়িতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি এক অন্য লড়াইয়ের জগত লক্ষ করেন। সুমিতার পরিবারও লড়াই করছে, বাঁচার লড়াই। তারা চার বোন, সঙ্গে বিধবা মা। ছোট বোন পঙ্গু। বাকি দুই বোন সংসার চালানোর লড়াই করছে। সুমিতাই বড়। মেজ বোন নাটক করে, আর সেজ বোন কলেজ ছাত্রী। সুমিতাকেই সবচেয়ে বেশি লড়াই করতে হচ্ছে। বি.এ. পাশ করা সত্ত্বেও এই দুঃসময়ে কোনো চাকরি সে জোগাড় করতে পারছে না। তাই তিন চারটে টিউশনি, বাড়ির ভাড়া আদায়ে তার সংসারের হাল কিছুতেই না ফেরায় গান শেখা এবং সংস্কৃত শিক্ষায় সে মনোনিবেশ করেছে। গান শেখাটা সময় উপযোগী হলেও প্রাচীন ভাষা শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশের কারণ অনঙ্গমোহন জানতে পারেন। সুমিতা চায় সংস্কৃত শিক্ষার পরে যদি টোল খোলা যায় বা 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পেলে স্কুল মাস্টারি করা যায় তবে তার পরিবারের অভাব দূর হবে। প্রথমত, সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে অবৈতনিক শিক্ষা হওয়ায় সুমিতার আগ্রহ জন্মালেও পরে সে এই শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। ফলে অনঙ্গমোহনের সুছাত্রী হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু সুমিতার বাড়িতে এসে অনঙ্গমোহনের সামনে অন্য রহস্য উদ্ঘাটন হল। তিনি লক্ষ করেন, তাঁর লড়াইয়ের চেয়ে অনেকগুণ বেশি লড়াই করতে হচ্ছে সুমিতাকে। এক বাঁচতে চাওয়া মানুষ আর এক বাঁচতে চাওয়া মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে।

একদিকে দেশীয় পরিস্থিতিতে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আর অন্যদিকে অন্তর্জগতে অনঙ্গমোহনের লড়াই। একটা লড়াইকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। সংস্কৃত ভাষাকে কিছুতেই বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিতে রাজি নন তিনি। তাঁর লড়াইয়ে সামিল হয়েছে বিলু আর অসীম। সে লড়াই ছাত্র জোগাড় করার। কিন্তু বর্তমান সময়ে কেউই আর টোলে পড়তে চায় না। আসলে উপন্যাসে টোল শিক্ষার অবলুপ্তির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে অনঙ্গমোহনের জীবন-কাহিনির মধ্য দিয়ে। সে লড়াই-এ অনঙ্গমোহনের শেষ পরিণতি কী? ঔপন্যাসিক পরবর্তী ঘটনায় প্রবেশ করেছেন। টোল বাঁচানোর লড়াইয়ে বিলু আর অসীম ব্যর্থ হয়। বর্তমান সময়ে কেউ সময় অপচয় করে সংস্কৃত শিখতে চায় না। তবে চায়ের দোকানদার ন্যাড়া ওরফে স্বপন সরকার সংস্কৃত শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ সে অর্থ উপার্জনের ধান্দায় কলেজ শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারেনি। আর টোলের শিক্ষা তো অবৈতনিক। ফলে তার দু'কুলই রক্ষা পাবে। এই আশায় সে চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হয়। জোর উদ্যমে অনঙ্গমোহন তাঁর চতুষ্পাঠীর শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর চতুষ্পাঠীতে পৌত্রী স্বপ্না আর ন্যাড়াকে দিয়ে মোট ছয় জন শিক্ষার্থী। এবার অনঙ্গমোহন মন দিয়ে শাস্ত্রের সেবা করবেন। কিন্তু নিয়তি কি

ব্যক্তি জীবনে কোনো রকম প্রভাব ফেলে না? অজিতবাবুর সঙ্গে সুমিতার একটা অবৈধ সম্পর্ক আঁচ করে শিখার মা। সে অনঙ্গমোহনকে অনুরোধ করে সুমিতা যাতে আর টোলে পড়তে না আসে। এবার কি করবেন অনঙ্গমোহন? সুমিতাই তো তার অন্ধকারের প্রদীপ। সংস্কৃত ভাষাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার রসদ। তাই শিখার মায়ের গায়ে আগুন লাগানোর ঘটনায় সুমিতার টোলে না আসতে পারার শঙ্কায় অনঙ্গমোহন উপস্থিত হন সুমিতাদের বাড়িতে। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে সুমিতাকে উপাধি পরীক্ষা দেওয়াতে চান। সবই পেটের তাগিদ। তা নইলে নিজের অস্তিত্বই হয়ে পড়বে লুপ্তপ্রায়। শুধু নিজে বাঁচবেন তাই নয়, তিনি সুমিতাকেও বাঁচাতে চান। অজিতবাবুর সঙ্গে সম্পর্কের আঁচ পেয়ে অনঙ্গমোহন সিদ্ধান্ত নেন সুমিতার বিবাহ দিলে সে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

সবকিছু নিয়ে অনঙ্গমোহন টিকে থাকার লড়াইয়ে লেগেছিলেন নিরন্তর। তবে কখনোই তিনি হীনমন্যতাবোধে ভোগেননি। সালটা ১৯৬৫; চারিদিকে খাদ্য সংকটের বাতাবরণ। অনঙ্গমোহনের মতো উদ্বাস্তুজীবনের দশা আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে এই পরিস্থিতিতে। অন্যদিকে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারিণী অঞ্জলির টিন কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যায় মিষ্টান্ন নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্য। পরিবারে উপোসের দিন নিকটেই কড়া নাড়তে থাকে। সুমিতার সহায়তায় একটা প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। কিন্তু সে কাজ পাওয়ার আগেই অঞ্জলি কাজ হারায়। অন্যদিকে চতুষ্পাঠীটি নিয়ে সংকট উপস্থিত হয়। চতুষ্পাঠী ইন্সপেকশনে এসে অফিসারটি পৌত্র ও পৌত্রীর নাম দেখে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করার মন্তব্য করে যান। ফলে চতুষ্পাঠী থেকে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায় অনঙ্গমোহনের। লজ্জায়, হীনমন্যতাবোধে অনঙ্গমোহন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না যেন। এতদিনের সংস্কার, একগুয়েমিতা নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে অনঙ্গমোহন কঠিন অস্তিত্ব সংকটে পড়েন। নিজের ওপর ক্রোধের তাড়নায় তার সমস্ত কিছু ভস্ম করে দিতে ইচ্ছে হয়। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন—

> *"অকালবর্ষণ হয়ে গেছে একটু আগে। পিচপথ সিক্ত। আকাশে মেঘ। যাও মেঘ, তুমি নীলকমলের কাছে যাও, তারে কও, বাগবাজারের খালপাড়ে খাড়াইয়া খাড়াইয়া তোমার পুত অনঙ্গমোহন কান্দে। তারে কও, অনঙ্গমোহন আজ পরাজিত। তারে কও তোমার শব্দবন্ধ মিথ্যা। মিথ্যা কলাপ পাণিনি। মনুসংহিতা মিথ্যা। মিথ্যা পরাশর। নৈষধের পদলালিত্য মিথ্যা। মিথ্যা যমক অনুপ্রাস। সমাস কী কাজে লাগে? ব্যুৎপত্তি, সন্ধি? এরে দিয়া জুটে না পচা পুঁটি মাছ।'"*[৬]

অনঙ্গমোহনের নিজের অবস্থার ওপর অনুশোচনা হয়। যে বৃত্তির ধারক এবং বাহক তিনি, সে বৃত্তির অবস্থা আজ অচল। তার চেয়ে তিনি যদি পুরোহিত হতেন, যদি মিথ্যে প্রবচনে দেবতার ঘটস্থাপন মন্ত্রে গৃহস্থকে সন্তুষ্টি দান করতে পারতেন, বা ফুলের সাজি হাতে দোকানে দোকানে ফুল ছিটাতে পারতেন তাহলে এ যাত্রায় সংশয়াপন্ন হতে হত না। নিদেনপক্ষে যদি ময়রা হতেন বা চপ বিক্রেতা, নয়ত রিকশা চালক, তাতেও রক্ষা না পেলে বেশ্যার দালাল বা কলের মিস্ত্রি। কিছু একটা অন্য কাজ করতে পারলে তার পরিবার আজ কঠিন সংকটে পড়ত না। বিধবা পুত্রবধূ, পৌত্রী, পৌত্রকে নিয়ে খেটে খেটে দিন অতিবাহিত হয়ে যেত নিশ্চয়ই। যে ভাবে সময়ের সঙ্গে কামাখ্যাচরণ অভিযোজন করেছে, সে পথেও কী যেতে পারত না অনঙ্গমোহন? জীবন তাঁকে এমনই এক বাঁকে এনে দাঁড় করিয়েছে যেখানে পথ অনুসন্ধান খুব জরুরী। তিনি পথ খুঁজবেন কি পথ তাঁকেই খুঁজে নেয়। সমস্ত শাস্ত্রের পৃষ্ঠা দিয়ে তিনি বাড়িতে ঠোঙা বানানোর পথ খুঁজে পান। তাই নিজের হাতে সমস্ত পাঠ্য গ্রন্থগুলি তিনি ছিঁড়তে থাকেন। বিলু এসে বাধা দিলেও তাকে আটকানো মুশকিল হয়ে পড়ে। অবশেষে তিনি ক্ষান্ত হন। বিলুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বাঁচতে ইচ্ছে করে, কারণ—

> *"বিলু বলেছিল, ঠোঙা যদি বানাতেই হয়, বাইরে থেকে কাগজ নিয়ে আসব। এসব বই ছিঁড়ছ কেন দাদু। অঞ্জলিও কোমরে কাপড় গুঁজে নেয় তখন। একটা একটা করে ছেঁড়া পাতাগুলি কুড়িয়ে দেয়। স্বপ্না পৃষ্ঠা মিলিয়ে ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো ঠিক করে গুছিয়ে রাখে। অঞ্জলি বলে, পরে সেলাই করে দেব। অনঙ্গমোহনের তখন মনে হয় এই পৃথিবী খুব একটা খারাপ জায়গা নয়।"*[৭]

অনঙ্গমোহন পরিবারের সকলের সঙ্গে ঠোঙা তৈরির কর্মযজ্ঞে নেমে পড়েন। জীবনে এ লড়াই কতদূর পর্যন্ত সঙ্গ দেবে তা কেউ জানে না। তবে অনঙ্গমোহনের লড়াইকে শ্রদ্ধা জানায় জ্ঞানপিপাসু চা বিক্রেতা ন্যাড়া—

> *"... পণ্ডিতমশাই, আপনাকে দেখে আমার ভুল ভেঙেছে। আগে জানতাম, নামাবলী জড়ানো টিকিওলা ব্রাহ্মণ মানেই অং বং করে দক্ষিণা চায়। আপনি আলাদা। আপনি অন্য একটা লড়াই করছেন। আপনাকে দেখে আমার শ্রদ্ধা হয়।"*[৮]

নতুন উদ্যমে কাজ করতে থাকেন অনঙ্গমোহন। ঠোঙা বিক্রির ব্যাপারটা অসীম আর বিলু করলেও অনঙ্গমোহন এবার নিজে উদ্যোগী হন। কারণ তিনি অভিভাবক। তারা এখনি কাজে নেমে পড়লে পড়াশুনোয় ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে অনঙ্গমোহনও হয়ে ওঠেন ঠোঙার ফেরিওয়ালা। তিনি জানেন

সামাজিক সম্মান বর্তমান যুগে অর্থ নির্ভর। তিনি বুঝে গিয়েছেন—

"বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে এখন ভুল। উত্তমা মানমিচ্ছন্তি ধনমিচ্ছন্তি অধমা—
একটা মিছে কথা মনে হয়। আসলে এটা একটা সংস্কার। কুলগত সংস্কার।"[৯]

পশ্চাৎ বিবেচনা করা নতুন কর্ম-উদ্যোগীর কাজ নয়। অনঙ্গমোহনও করেননি। তিনি নতুন উদ্যমে ঠোঙা ফেরি করতে বেরিয়ে পড়লেও বারবার ব্যর্থ হয়েছেন দিন ভর। তিনি প্রমাণ পেয়েছেন তার দ্বারা অন্তত ঠোঙা ফেরি করা হবে না। এমনকি, অনেকে পণ্ডিতমশাইয়ের ঠোঙা ফেরি করাকে সাদরে আমন্ত্রণ না করে তাকে করুণার চোখে দেখেছেন। আর অনঙ্গমোহনের অভিজ্ঞতা কী? তিনি সামনে দেখতে পেলেন আরও এক লড়াইয়ের জগৎ। যেখানে পুরাতনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় নতুনের জন্য। নতুন প্রজন্মের নতুন আবিষ্কারকে স্বাগত জানাতে হয়। অনঙ্গমোহনের সামনে সেই ক্ষণই উপস্থিত হয়। তিনি লক্ষ করেন, তাঁর লড়াই এখানেই থেমে যাবে না। তাই নিজের পাড়া নয় অন্য পাড়া এখন তার গন্তব্য। কিন্তু হঠাৎ থেমে যান তিনি, কারণ—

"পণ্ডিতের পক্ষে ঠোঙা বিক্রি করাও কঠিন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন অনঙ্গমোহন,
এমন সময় সামনের একটা ওষুধের দোকান থেকে একজন ভদ্রলোককে বের
হতে দেখলেন অনঙ্গমোহন। তার হাতে কাগজের ঠোঙা নয়। ঠোঙাটি এমন,
ভিতরের বস্তু দেখা যায়। পলিথিন ব্যাগ। ঠোঙার শত্রুকে দেখলেন
অনঙ্গমোহন। অনঙ্গমোহন তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। কলিতেও যদি ব্রহ্মতেজ
থাকত, তবে ঐ দৃষ্টিতে ভস্ম হয়ে যেত কলির পলিথিন।"[১০]

শুধুমাত্র ঠোঙা বিক্রি করে অনঙ্গমোহনের পরিবার ঠিক মতো চলছে তা নয়। শিখার মা গায়ে আগুন দেওয়ার পরে অসহায় অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে তাদের রান্নার কাজ হাতে নিতে হয় অঞ্চলিকে। সেখান থেকে যা টাকা পায় তাতে সংসার খরচ এবং বিলুর পড়াশুনায় খরচ হয়। কিন্তু এই অন্নকষ্টের দিনে অসীমের গ্রাসাচ্ছাদনে অঞ্জলির আপত্তি থাকায় বুকে পাথর চাপা দিয়ে শ্যালক বোবাঠাকুরের কাছেই অসীমকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন অনঙ্গমোহন। অসীমের গুরুগৃহ ত্যাগের অর্থ অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠীর মূল ধারা থেকে চ্যুত হওয়া। কারণ অসীমকে গুরুগৃহে রেখে অবৈতনিক শিক্ষা দান করিয়ে গুরুর উপযুক্ত শিষ্য তৈরি করা অনঙ্গমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। সে পথে বাধা প্রদান করে ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন। চারিদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারি ইত্যাদি সমসাময়িক পরিস্থিতি। বিদায়ের সময় অনঙ্গমোহন অসীমকে আশীর্বাদ করেন এই বলে—

"... অসীম, তুই পড়াশুনা ছাড়িস না। সংস্কৃত না পড়িস— না পড়িস, ইংরাজি পড়িস, অঙ্ক করিস। অঙ্ক, অঙ্ক।"[১১]

অসীমের ভবিষ্যৎ অনঙ্গমোহনের দ্বারা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তিনি আদর্শ চতুষ্পাঠীর শিক্ষক হতে পারেন কিন্তু পরিস্থিতি তাকে সে পথে চলতে দেবে না। তিনি তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই যুগের সঙ্গে অভিযোজনের প্রয়োজন অসীমেরও। যথার্থ গুরুর আশিষবচনকেই তিনি অসীমের পথের সঙ্গী করতে চেয়েছেন। অসীমও চায় সে পথে বেরিয়ে পড়তে। যেখানে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে টিকে থাকাই জীবনের পাথেয়। অসীমের দায়িত্ব একরকম করে মিটে গেলে অনঙ্গমোহন সুমিতার বিবাহ দেওয়ার জন্য মনোযোগী হন। ঠোঙা বানানোর কাগজ থেকে সুমিতার জন্য জাহাজ কোম্পানীতে চাকুরিরত পাত্রের সন্ধান পান। তারা সংস্কৃতজ্ঞ কন্যার সন্ধান করছেন। পাত্রের পিতা ললিতমোহন মিত্র বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃতের শিক্ষক। অনঙ্গমোহন পাত্রের পিতার সঙ্গে কথা বলে সুমিতার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। সুমিতার বিয়েও হয়। বিয়েতে দরিদ্র অনঙ্গমোহন তাঁর 'নৈষধ চরিত' গ্রন্থটি উপহার হিসেবে দেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি সুমতিারও অবজ্ঞা জন্মায়। শ্বশুর মারা যাওয়ার পর স্বামীর আগ্রহে বাড়িতে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল খোলে সুমিতা। সংস্কৃত সেখানে ব্রাত্য। তাই হয়ত তাঁর বইগুলি স্থান পায় কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকানে। তবে অনঙ্গমোহন যখন তাঁর বই সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষকের হাতে দেখেন তখন তাঁর সম্বিত ফেরে। তিনি বুঝতে পারেন সংস্কৃত শিক্ষা থেমে থাকবে না। তবে রূপান্তর ঘটবে।

অনঙ্গমোহনের সামনে পরিবারের সংকট আরো দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ঘরে চাল না থাকায় বিলু আংটি বিক্রি করে চালের জোগাড় করে। সে আংটি উপনয়নের সময় মামার কাজ থেকে বিলু উপহার পেয়েছিল। কিন্তু কয়লার জোগাড় হবে কী করে? অনঙ্গমোহন নিজে কয়লা জোগাড় করার উদ্যোগ নেন। এতদিনের ভাবধারার স্খলন ঘটে। নিরুপায় হয়ে নীতি বিসর্জন দিয়ে কয়লা চুরির পথে নেমে পড়তে হয় অনঙ্গমোহনকে। উদ্দেশ্য একটাই— পরিবারকে বাঁচানো। এহেন পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা থেকে বাল্যবন্ধু হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হন। এক দিকে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা, তার উপর কুটুম্বর আগমন অঞ্জলি ভালো চোখে নেয় না। নানা কটুকথা শুনতে হয় অনঙ্গমোহনকে। কিন্তু তিনি কী করবেন? ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হেরম্ববাবু। শেষ চেষ্টা করতে বড় ছেলের সঙ্গে অনঙ্গমোহনের বাড়িতে উপস্থিত। বড় ছেলে মামাশ্বশুরের বাড়িতে উঠলেও হেরম্ববাবু অনঙ্গমোহনের বাড়িতেই থাকতে চান। কারণ, তিনি স্বপাকে আহার করেন। এই বন্ধুই অনঙ্গমোহনের সামনে আরও বড় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ান। অনঙ্গমোহনের অনুপস্থিতিতে

হেরম্ববাবুর সেবা করার দায়িত্ব স্বপ্নার উপর পড়ে। কিন্তু হেরম্ববাবু শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার শিকার হওয়ায় তিনি স্বপ্নাকে ভোগ করতে চেষ্টা করেন। যথা সময়ে অনঙ্গমোহনের আগমনে স্বপ্নাকে তিনি ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে পারেন ঠিকই কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন না। কারণ স্নেহের সংস্কৃত শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে হেরম্ব ষোড়শী কন্যা স্বপ্নাকে ভোগ করতে চেয়েছেন। তিনি শাস্ত্র থেকেই জেনেছেন ষোড়শী সান্নিধ্যে দেহ নীরোগ হয়। শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যায় অনঙ্গমোহন অনুভব করেন আসল দোষ ভাষার নয়, মনের। আমরাই শাস্ত্রের সঙ্গে বিকার যোগ করে তার ভুল ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যাই।

অনঙ্গমোহন অনুভব করেন অন্নহীন পরিবারে স্বপ্নার কৌমারিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। তিনি কিছুদিন যাবৎ ন্যাড়া ও স্বপ্নার মধ্যে এক অনুকম্পার সম্পর্ক তৈরি হওয়ার আঁচ পান। তিনি সিদ্ধান্ত নেন এসময় অন্নের সংস্থানই সবার আগে দরকার। তাই সমাজের শ্যেন দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অসবর্ণ বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হন। বিয়েতে তিনি সুমিতা ও তার শ্বশুর মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করলেও প্রতিবেশীদের তেমন বলেননি। কারণ, তিনি ন্যাড়া আর স্বপ্নার বিয়েতে চিরাচরিত বিবাহের বাইরে বেরিয়ে নিজের মতো করে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তিনি অন্ন-এর বন্ধনে দু'জনকে বাঁধতে চেয়েছেন। আসলে অনঙ্গমোহন কঠিন পরিস্থিতিতে বাস্তববোধশূন্য হননি। তিনি নিজের মনের গোপন কোণে সংস্কৃত প্রেমকে লালন করেছেন। তাকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন। দু'জন ছাত্রের মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েও তা আর হয়ে ওঠেনি। সুমিতার বিবাহের পর তার পূর্বরূপের পরিবর্তন বা সময়ের অভিযোজন অনঙ্গমোহনের আঁতে ঘা দিলেও সত্য এটাই, যে মানুষ তার প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়। অসীমেরও পরিবর্তন হয়েছে। সে গুরুগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে চালের লাইনে কাজ নেয়। সেই লাইনের হালহকিকত এক মাসের মধ্যেই সে রপ্ত করে নেয়। চালের আকালের দিনে অনঙ্গমোহনের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সে অন্নদাতার ভূমিকা পালন করে। অসীমের মধ্যে সমকালের ছায়াপাত লক্ষ করেন অনঙ্গমোহন। তীব্র ক্ষোভ উৎপন্ন হয় তার নিজের ওপর এই ভেবে যে, তাঁর দেওয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ বৃথা। অসীমের দেওয়া চালের ভাত অনঙ্গমোহন গ্রহণ করতে চাননি, তাঁর নিজের ব্যর্থতার জন্য। তবে কয়েকদিন পরিবারে অন্ন কষ্ট চলায় অনঙ্গমোহনের ক্রোধ মৃয়মান হয়ে আসে। সুমিতার শ্বশুর মহাশয়ের চেষ্টায় রেডিও সেন্টারের একটি অনুষ্ঠানে কাজের দরুণ কিছু টাকা হাতে এলেও অঞ্জলির পুনরায় চাকরি চলে যাওয়ায় অনঙ্গমোহনের হাতে কোনো টাকাই অবশিষ্ট থাকে না। এবারে অনঙ্গমোহন নিঃস্ব। জীবনকে কোন পথে চালিত করবেন তিনি? — এই জিজ্ঞাসা প্রতিনিয়ত তাঁকে তাড়া করে।

চারিদিকে খাদ্য আন্দোলন চলছে, সরকার বদলের আবহাওয়াও গুঞ্জন তুলেছে। দেওয়াল লিখনে নতুন সরকারের মধ্য দিয়ে দিন বদলের আশায় পশ্চিমবাংলার অধিবাসীরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। অনঙ্গমোহনও স্বপ্ন দেখছেন নতুন পৃথিবীর। তিনি এও আশা করেছেন কমিউনিজমেই বাংলার মুক্তি হবে। ভাবছেন সংস্কৃত ভাষাটাও যদি টিকে যায়! কারণ কোনো কিছুর সঙ্গেই যে অভিযোজন আর হয়ে উঠছে না। সুমিতার শ্বশুর মহাশয়ের দ্বারা রেডিও সেন্টারে সংস্কৃত চর্চার একটা সুযোগ পেয়েও তিনি তাদের দেওয়া নির্দেশ আত্মস্থ করতে পারলেন না। তাহলে তিনি কোথায় দাঁড়াবেন? কেউ তো সংস্কৃতকে ধরে রাখতে পারল না। না অসীম, না সুমিতা, না নিজে। সময়ের স্রোতে সব কিছুই বিলীয়মান। এখানেই শেষ নয় অনঙ্গমোহনের লড়াই। বাংলা বনধ্ চলছে, চলছে ব্ল্যাক আউট। আর এক অভিঘাত এসে পড়ে অনঙ্গমোহনের জীবনে। অন্তঃসত্ত্বা স্বপ্নাকে রেখে ন্যাড়া পুলিশের গুলিতে মারা যায়। অঞ্জলি চায় এ সন্তান পৃথিবীর মুখ না দেখুক। হয়ত অঞ্চলি আগম অনেক কিছু ভাবতে পেরেছিল বলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। পরিবারের হাল ধরতে, সবার মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে, এবার বিলু উদ্যোগী হয়ে উঠল। তার পড়াশুনো, মায়ের স্বপ্নপূরণ, সেসব কিছু এখন বড় নয়। এখন পেটের ক্ষুধা নিবারণের সময়। বিলু ন্যাড়ার দোকানে বসার উদ্যোগ করতে থাকলে অনঙ্গমোহন সেই দোকানে সহযোগী হওয়ার চেষ্টা করে। মালিকের কাছ থেকে কুপ্রস্তাব শোনার পর অঞ্জলি চাকরি ছেড়ে দেয়। সে বিলুকে মানুষ করার স্বপ্ন দেখে। বিলু সায়েন্স নিয়ে পড়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে— এই স্বপ্ন অঞ্জলির। কিন্তু দারিদ্রের কারণে সে স্বপ্ন অধরার পথে পাড়ি দিতে চায়। তাই মালিকের বাড়িতে অপমানের চাকরিটাকেই আবার বেছে নেয় অঞ্জলি; একদিকে কন্যা অন্যদিকে পুত্র সবাইকে বাঁচাতে হবে। অনঙ্গমোহন চান এই অবস্থায় আর পূর্বের ধারণা ধরে থাকলে হবে না। তাকে তন্ত্রধারীই হতে হবে, পৌরোহিত্যই করতে হবে, লোক ঠকাতে হবে। আর সংস্কৃত ভাষার আঁচল ধরে থাকলে চলবে না। তিনিও প্রথানুগত্যকে প্রাধান্য দেবেন—

> *"আমিও যামু। আমিও কাল ভোরবেলায় গঙ্গার পাড়ে গিয়া দাঁড়ামু। পথ বেশ্যারা যেমন যৌবনলক্ষণ প্রদর্শন করে, সেরকমভাবে আমি আমার শিখাসূত্র ও নামাবলী প্রদর্শন কইরা দাঁড়ামু।"*[১২]

অনঙ্গমোহন তো জানেন আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বশীভূত হয় না; তাকে এতেই সন্তুষ্ট থাক বলা মানে অপমান করা। কারণ তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আত্মাকে নিয়ে খেলা করার নাম পৌরোহিত্য। শেষ পর্যন্ত অনঙ্গমোহনের দ্বারা সে কাজও হল না। তিনি বিলুর নতুন পথে যাত্রার সঙ্গী হতে

হাজির হলেন—

"বিলুরে বিলু আমি, পারলাম না। অনঙ্গমোহনের চোখে জল।
মন্ত্র পড়াইয়া দক্ষিণা চাওয়া আমার দ্বারা হইল না। আমি কুষ্মাণ্ড। আমি গর্ভস্রাব।
আমি কিচ্ছু না। আমি বোঝা।"[১৩]

তিনি অনুভব করেন শেষ লড়াইটা সংস্কৃত শাস্ত্রের ওপর ভর করে আর চলবে না। তাই প্রকৃত অভিভাবকের মতো বিলুকে তিনি বলেন—

"তুই ঘরে যা বিলু, ঘরে যা। বীজগণিত কর। বস্তুবিদ্যা পড়। বিদ্যার কোনও
বিকল্প নাইরে বিলু, অবিদ্য: জীবনং শূন্য। আমিই বরং চায়ের দোকান করি।
পারুম। এই কাম আমি নিশ্চয় পারুম।"[১৪]

স্টোভের অগ্নি সংযোগ বৃদ্ধি করে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করেন তিনি। অগ্নি দেবতাকেই এতদিনের সঞ্চিত বিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে যে অহংবোধ মিশ্রিত ছিল সে সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হলেন। তাঁকে অভিযোজন করতে হবে সময়ের সঙ্গে; সংস্কৃতশাস্ত্র তাঁকে পেটের অন্ন যোগাবে না। তাই শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় চায়ের সঙ্গে সুজি, বিস্কুট দেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন। তিনি সর্ব-অহংকার ত্যাগী হবেন। কারণ পরিবারের কল্যাণ এখন অনঙ্গমোহনের চাহিদা; সেই চাহিদাকে পূরণ করতে হবে। বাঁচতে হবে পরিবারের সকলকে নিয়ে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকাই বেঁচে থাকা— এ সত্য অনঙ্গমোহনের জানা। তাই তিনি দোকানের ফুটন্ত চায়ের জলের সঙ্গে উচ্চারণ করেন—

"... হে জল, চায়ের জল হে, আমাদের অন্নভোগের অধিকারী কর। রমণীয়
ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত কর। কারণ অন্নই ব্রহ্ম। আমারে বাঁচাও।"[১৫]

অনঙ্গমোহনের চরিত্রের দৃঢ়তা থেকে স্খলনের চিত্র ঔপন্যাসিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সহানুভূতির সঙ্গে। এক সংস্কৃত ভাষাপ্রেমি মানুষের জীবনচিত্র কীভাবে বিচিত্র পথে এগিয়ে চলেছে তারই চালচিত্র 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাস। অনঙ্গমোহনের চরিত্রের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক যেমন একটা প্রজন্মের বিশ্বাস, সংস্কারকে তুলে ধরেছেন, তেমনি বিলু ওরফে বিপ্লব চরিত্রের মধ্য দিয়েও ঔপন্যাসিক নতুন প্রজন্মের মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের কুড়িটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে বিলুর বেড়ে ওঠা এবং ওর উপনয়নের চিত্রের মধ্য দিয়ে কাহিনির শুরু। শেষতম অধ্যায়টিতেও বিলুর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের নতুন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। অনঙ্গমোহনের সঙ্গে সঙ্গে নবীন কিশোর বিলুর মানসিকতা, তার দৃষ্টিতে সমকালের রূপ বদল, মায়ের কষ্ট, দাদুর সংস্কৃত ভাষাপ্রেমী মন, দিদির যৌবন শুরু এবং নারীর সঙ্গে পুরুষের পার্থক্য,

নানা দিক থেকে বিলুর ভাবনার জগৎকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। বিলুর মধ্যেও জেগে উঠেছে জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসার চিত্র।

বিলু ছোট থেকেই সময়ের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছে। পরিবারের আর্থিক অনটন তাকে পরিস্থিতিকে বুঝতে শিখিয়েছে। সে দেখেছে কীভাবে তার দাদু অনঙ্গমোহন পুরোনো সংস্কারকে ত্যাগ করতে না পারার জন্য সারা জীবন কষ্টের মধ্য দিয়ে যাপন করেছেন। তাই সে কোনো সংস্কারকে অনুকরণ করতে হবে, বা সত্যপালন করতে হবে— এই গোঁ ধরে বসে থাকতে চায়নি। বিলু তার বাবাকে দেখেছে কীভাবে সংসার চালানোর জন্য হারভাঙ্গা খাটুনি করতেন। সংসারের খোরাক একটু বাঁচাতে চেয়ে তিনি প্রায় না খেয়ে, বাঁধা চাকরির পর টিউশনি করেছেন। এইভাবে অন্ন বাঁচাতে গিয়ে নিজের জটিল রোগ বাঁধিয়ে বসেছেন। অনঙ্গমোহনের জমানো টাকাও জগদীশকে বাঁচাতে পারেনি। বাবার মৃত্যুর পর মা অঞ্জলিকে চাকরি নিতে হয়েছে বাবার অফিসেই। পুরুষের শ্যেণ দৃষ্টি অঞ্জলিকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। তবুও স্বপ্না এবং বিলুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চাকরি করতে হয়েছে। এসব কিছুই বিলুর কিশোর মন অনুধাবন করতে পারলেও তার করার কিছুই ছিল না। তাকে মানুষ হতে হবে এই তার এক মাত্র কাজ। তবে বাবার মৃত্যুর কারণ হিসেবে তার সন্দেশ আনাকেই দায়ি করে বারবার হীনমন্যতায় সে ভুগেছে। সে চেষ্টা করেছিল বাবার অসুস্থতায় বাবাকে কিছু ভালো খাওয়াতে। তাই নিজের আদর্শবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে কালির বড়ি চুরি করে। সেটা বিক্রি করে দু'পয়সা জোগাড় করে বাবার জন্য সন্দেশ কিনে সন্তর্পণে যেতে গিয়ে হাত থেকে সন্দেশ দুটো পড়ে যায়। আগাপাছতলা বিবেচনা না করে বিলু পড়ে যাওয়া সন্দেশ বাবাকে এনে খাওয়ায়। কিন্তু পরের দিনই বাবার জ্বর, অবশেষে মৃত্যু। বিলু এই ঘটনাকে নিজের কাঁধে নিয়ে চলতে শুরু করে। সে মনে করে বাবাকে বিষ সন্দেশ খাওয়ানোর জন্যই তাকে পিতৃহীন হতে হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর বিলু লক্ষ করেছে, দাদু অনঙ্গমোহন কতটা অসহায় হয়ে পড়েছেন। কারণ বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী না থাকা। দাদু চতুষ্পাঠী চালানো ছাড়া আর কিছুই পারেন না। তাই পুত্রের মৃত্যুতে তার সামনে সমস্ত পথই যেন বন্ধ হতে দেখেছেন। বিলু লক্ষ করেছে, দাদু তার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে আপ্রাণ ভালোবাসেন। কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে অর্থ উপার্জন করতে নয়। ফলে দাদুর চরিত্রের দৃঢ়তা তাকে দোলাচলতায় ফেলে দেয়। সে দেখতে দেখতে বড় হয়েছে যে তারা উদ্বাস্তু, রিফিউজি। তাদের পরিবার শিখাদের পরিবারের মত সুখী পরিবার নয়। তার দিদিকে কষ্ট করেই বয়ঃসন্ধিকে রক্ষা করতে হয়— মায়ের সখ আহ্লাদ পূরণ করতে হয় শিখার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করার পরও নিজের গরজে কথা বলে সবকিছু মিটিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে।

একটা কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবারের যাত্রা। বিলুর ভালো নাম বিপ্লব। ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন ১৯৪৭খ্রিস্টাব্দের আগে বিপ্লব ও স্বপ্না নাম পাওয়া যেত না। বাবা মায়েরা নতুন যুগের স্বপ্ন দেখত। সেই সূত্রেই এমন ধরনের নামকরণ শুরু হয়। বিপ্লবের নামের সঙ্গেই যেন তেমনি কিছু জড়িত। বাবার মৃত্যুর পরে কোম্পানির স্টাফ যশবাবু বাড়িতে এলে জগদীশের চাকরির বদলে অন্য কাকে চাকরি দেওয়া যায় এই প্রসঙ্গ উঠলে বিলু বলে ওঠে— *"আমি চাকরি করব, আমার হয় না চাকরি?"*[১৬]

বিলু জানত— অনঙ্গমোহনের দ্বারা চাকরি করা সম্ভব নয়। তাই সে নিজেকে বাড়ির অভিভাবকের জায়গায় বসায়। সে মনে করে পড়াশোনা আর তার হবে না। কারণ অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠীতে পাঁচজন ছাত্র নেই, থাকলে সরকারি কিছু টাকা পেতেন তিনি। কিন্তু সে পথে চলার মতো পরিস্থিতি বিলু দেখতে পায় না। আর মেয়েদের সে সময় বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। তবে উদ্বাস্তুস্রোত পশ্চিম বাংলার সে ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু করে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী উদ্বাস্তু নারীরাই কর্মজগতে প্রথম বাড়ির বাইরে পদার্পণ করে। উপন্যাসে অঞ্জলি তেমনি এক চরিত্র। যাকে পরিবারের অনটনে বাইরে কর্মসংস্থানে যেতে হচ্ছে। শুধু অনঙ্গমোহনই নয়, উপন্যাসে বিলুর জীবন জিজ্ঞাসাও ভিন্ন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। অনঙ্গমোহনের শিখিয়ে দেওয়া সত্যের পথে, সংস্কারের পথে বিলু চলতে পারবে না। সে সম্পর্কে ঔপন্যাসিক ইঙ্গিত দিয়েছেন উপনয়নের পরে বিলুর চুপ করে বেগুনি খাওয়ার প্রসঙ্গে। তাহলে বিলুর সামনের পথ কী? দাদুর ইচ্ছাতে চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হয় সে। ফলে স্কুলের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি পড়া করতে হয় তাকে। দাদুর কাছ থেকে সে সংস্কৃত ভাষার গভীরে ঢোকার শিক্ষা পেয়েছে। কীভাবে এই ভাষায় সহজে অনেক দুর্বোধ্য এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে সে বিষয়ে বিলু অবাক হয়। অসীম ও বিলু দুজনেই স্কুলে পড়ে। তবে অসীমের ওপর দাদুর পক্ষপাতিত্বের কারণ সে অনুধাবন করে। অসীমের একনিষ্ঠতার অভাব বিলু বুঝতে পারে এবং দাদুর জন্য কষ্ট হয়। কিশোর বয়সের প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ের জ্ঞানের আদান প্রদান অসীমের সঙ্গেই হয় বিলুর। সম্পর্কে অসীম বিলুর কাকা। তবে তার সঙ্গে বিলুর বন্ধুত্ব অনেকটাই। অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠী বাঁচানোর জন্য অসীম আর বিলু দু'জনেই কাজে নেমে পড়েছিল—

> *"যুদ্ধে নেমে পড়েছে অসীম চক্রবর্তী। বিপ্লব ভট্টাচার্য। ছাত্র ধরার যুদ্ধ। অসীম ইস্কুলের গেটের ধারে পোস্টার সেঁটে দিয়েছে আঠা দিয়ে— বিনা পয়সায় সংস্কৃত শিক্ষা। সংস্কৃত শিখিয়া উপাধি লাভ করা যায়। যোগাযোগ করুন পণ্ডিত*

অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য, ঠিকানা ...''[১৭]

দু'জনেই চেষ্টা করেছে— স্কুলের ফার্স্ট বয়, বাবলুদা আরও অনেককে বোঝাত। যাতে তারা টোলে ভর্তি হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে সবাই টোলের শিক্ষা নেওয়াকে সময়ের অপচয় মনে করে, তা বুঝতে পারে তারা। অনন্য উপায় হয়ে ন্যাড়াকে ভর্তি হতে বললে বরং সে উৎসাহী হয়ে ভর্তি হতে চায়। এখানেই থেমে থাকা নয়। দাদুর উপার্জন-হীনতায় দাদুর মধ্যে হীনমন্যতা বোধের আঁচ করতে পারে বিলু। তাই ঠোঙা বানানোর কাজে বিলুও হাত লাগায়। সে বুঝেছে পরিবারের অন্নকষ্টের দিনে একে অপরকে আঁকড়ে ধরতে হয়। রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতির সম্পর্কে বিলুও ওয়াকিবহাল। সে খাদ্য সংকটের বিষয়টা বুঝতে পেরেছে। তাই ঠোঙা ফেরি করার দায়িত্বভার নিজের কাঁধে নিয়েছে, সঙ্গে অসীমও। পাড়ার যে দোকানগুলোতে বাকি ছিল সেগুলো ঠোঙা দিয়ে মিটিয়ে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, খাদ্য আন্দোলনের সময় বিলুদের বাড়িতেও চাল নেই, মায়ের অফিস বন্ধ, চাকরি চলে গিয়েছে। কিন্তু বিলুকে ভালোভাবে পড়াশুনা করতে হবে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঞ্জলি যখন মাড়োয়ারি বাড়িতে কাজ নিতে যায় তখন বিলু যেন এক ধাক্কায় অনেক বড় হয়ে ওঠে। টিনের বাক্সে রাখা আংটিটা বের করে চালের জোগাড় করতে সে বেরিয়ে পড়ে। খাদ্য সংকটের মধ্যেই অসীমকে আর বাড়িতে রাখা হয়ে ওঠে না অনঙ্গমোহনের। সে বাড়ি চলে যায় তার বাবা বোবাঠাকুরের কাছে। ইতিমধ্যে ন্যাড়ার সঙ্গে স্বপ্নার বিয়ে হয়। চতুষ্পাঠীর অবস্থাও করুণ। ছাত্ররা নিজের মতো করে টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। এমনকি বিলুও। রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে ন্যাড়ার গুলি লেগে মৃত্যু হয়। স্বপ্নার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা বিলুকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তার ওপর সে জানতে পারে স্বপ্নার সন্তানকে মা পৃথিবীর মুখ দেখাতে চায় না। কিন্তু স্বপ্নার করুণ আর্তি রয়েছে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। তখন পৃথিবীর বিশাল ক্যানভাস বিলুর সামনে। জীবনকে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চিনতে শিখল বিলু। সবার আগে প্রয়োজন অন্নের। সেই অন্নের সন্ধানে বিলু নেমে পড়তে চায়। তাই ন্যাড়ার দোকানেই শুরু করে তার আগামী যাত্রা। সে তার ব্রহ্মতেজ বজায় রাখতে চায় না। সে চায় মানুষের মত দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে। মিথ্যে আশা— যা সে অনঙ্গমোহনের মধ্যে দেখেছে সে পথে বিলু যাবে না। সময়ের সঙ্গে সেও অভিযোজন করতে শিখেছে। সে তার কিশোর অবস্থাতেই এই বোধে পৌঁছেছে— লেগে থাকাই টিকে থাকা। জীবন জিজ্ঞাসার নিরসন বোধহয় এখানেই উপনীত হয়।

উপন্যাসের মধ্যে অনঙ্গমোহনের পৌত্রী স্বপ্নার উপস্থিতি কম হলেও সে বিশেষ ছাপ ফেলেছে। সে মাঝে মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে। তবে বিলুর

বোধ গঠন বা উপন্যাস মধ্যে নারীবাদ ঘটিত দু'চারটে কথা বা পুত্র সন্তানের ওপর মোহ বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে যে আবহ তৈরি হয়েছে তা স্বপ্নাকে কেন্দ্র করে। অনঙ্গমোহনের সরলতা বোধকে কাজে লাগিয়ে হেরম্ববাবু ও স্বপ্নার যে পর্ব সংঘটিত হয়েছে তাতে নারীদের ওপর পুরুষদের যে লোভনীয় দৃষ্টি রয়েছে তার প্রকাশ পায়। তাছাড়া ন্যাড়ার মৃত্যুর পর তার সন্তানকে গর্ভে রেখে দিতে চাওয়ার মধ্যে নারীত্বের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। এবার অঞ্জলির কথায় আসা যাক। অনঙ্গমোহনের বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই পরিচিত হয় পাঠক। বিলুর উপনয়নের দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে সে বিলুকে মাথা উঁচু করে বাঁচার শিক্ষা দিতে চায়। বিলুর বাবা মারা যাওয়ার পর জগদীশের টিন কোম্পানির চাকরিতে সে যোগ দেয়। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে সন্তানদের মানুষ করার উদ্দেশ্যে সে পা বাড়ায়। এক রকম বাধ্য হয়েই সে কাজের জন্য বাইরে বের হয়। কারণ তার শ্বশুর মশায়ের উপার্জনের মাধ্যম নেই। তিনি জাত ব্যবসা করবেন না। তিনি চতুষ্পাঠীর শিক্ষক। অঞ্জলি অনঙ্গমোহনকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা করতে পারেননি এই কারণে। জগদীশের মৃত্যুর পর অনঙ্গমোহনকেই শক্ত হাতে পরিবারের ভার নিতে হত। কিন্তু অনঙ্গমোহন নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দুও নড়তে চাননি। অঞ্জলির রূঢ় মন্তব্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনঙ্গমোহনের দাম্ভিকতা এবং প্রাচীনতাকে আঁকড়ে ধরে থাকার মানসিকতা। উপরন্তু অসীমকে বাড়িতে রেখে পড়ানোর বিষয়টি অঞ্জলির সহ্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। মন থেকে মেনে নিতে না পেরে সে কটুকথার বাণে অসীমকে বাড়ি থেকে বিদায় দিতে বাধ্য করে অনঙ্গমোহনকে। ছেলে বিলুকে মানুষের মত মানুষ করতে চায় অঞ্জলি। পুরুষ ঘেরা অফিসে নানা কুরুচিকর প্রস্তাবের মধ্যে তাকে চাকরি করতে হয়। সব মেনে নিয়েছে সে। কিন্তু অনঙ্গমোহনের বোধহীনতা তাকে মাঝে মাঝেই বিমূঢ় করে দেয়। সব কিছুর মাঝে অনঙ্গমোহন অনুভব করে পুত্রবধূ তার সব কিছু সহ্য করে নিতে পারে। অঞ্জলিও বোঝে স্বামীহীন পরিবারে শ্বশুর মশায়ই তার একমাত্র ছত্রছায়া। ফলে পরিবারের সবাই একটা লড়াইয়ে আবদ্ধ। সে লড়াই পূর্ব অবস্থা থেকে ক্রমে স্খলন হয়ে চলার মধ্যে বাঁচার লড়াই।

অনঙ্গমোহনের সারাটা জীবনের স্পষ্ট চিত্রায়ণে অসীমের ভূমিকা রয়েছে। অসীমের প্রসঙ্গে আসে অসীমের বাবা বোবাঠাকুরের কথা। বোবাঠাকুরের প্রকৃত নাম হরিদাস চক্রবর্তী। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন দেশভাগের পূর্বে তার টিকির কারণে। নোয়াখালির দাঙ্গায় বোবাঠাকুরের শিখাটি কাটা যায়। বোবাঠাকুর সেই শিখাগ্রভাগটি পরম যত্নে রেখে দিয়েছিলেন। গান্ধীজি নোয়াখালিতে এলে শিখাগ্রভাগটি তাকে দেখান। এর ফলে হিতবাদী পত্রিকায় বোবাঠাকুরের ছবি ছাপা হয় এবং তিনি আর্থিক অনুদানও পান। শিখাটি নিয়ে তিনি হরেন মুখার্জির সঙ্গে দেখা করেন এবং বোবা না হলে

তাকে চাকরিও দেওয়া হত বলে রটনা ছড়িয়ে পড়ে। অনঙ্গমোহন নিজের সঙ্গে বিষয়টি মিলিয়ে দেখেন। বোবাঠাকুরের শিখার বদলে তার শিখাটি কাটা গেলে স্কুলে দেড়শ টাকার চাকরিটি তার হত। অর্থাৎ তিনি নিজের শোচনীয় অবস্থার ওপর হাস্যপরিহাস পূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন। বোবাঠাকুর পৌরোহিত্য করে জীবন যাপন করতেন। বহুদিন অতিবাহিত হলেও তিনি বিবাহ করেননি। সুরবালার অনুরোধে অনঙ্গমোহন তার দূর সম্পর্কীয় বোনের সঙ্গে বোবাঠাকুরকে বিবাহ দেন। সেই সময় থেকে বোবাঠাকুরের সঙ্গে তার যেন সম্পর্কের গভীরতা আরো বৃদ্ধি পায়। আসলে বেশি বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে প্রথম সন্তান জন্মাবার কিছু বছর পর যখন অসীমের জন্ম হয় তখন বোবাঠাকুরের বয়স পঞ্চাশোর্ধ। অসীমকে কীভাবে মানুষ করবেন এই আশঙ্কা বোবাঠাকুর ও তার স্ত্রীর মধ্যে দেখা দিলে অনঙ্গমোহন অসীমের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে চান। অসীম আট-নয় বছর বয়সেই অনঙ্গমোহনের কাছে চলে আসে এবং অনঙ্গমোহনের কাছেই তার 'উপনয়ন' হয়। এভাবে অসীম আবাসিক ছাত্র হিসেবে অনঙ্গমোহনের বাড়িতে রয়ে যায়। বোবাঠাকুরের সঙ্গে অনঙ্গমোহনের সম্পর্ক আসলে আশ্রয়ের। সে সম্পর্ক অর্থের মূল্যে নির্ধারণ করা যায় না।

উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষগুলির তাদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে বহুদিন সময় লাগে। অনঙ্গমোহনের পরিবারও উদ্বাস্তু পরিবারের একটি রূপ। তবে যেহেতু স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে অনঙ্গমোহনের এ বাংলায় চলে আসা তাই তাদের পায়ের নিচের মাটি খুঁজতে তেমন কষ্ট হয়নি। তবে 'বাঙাল' হওয়ার অবমাননা তাদেরও সহ্য করতে হয়েছে। বিলুর সে অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে অঞ্জলিরও হয়েছে। কিন্তু অনঙ্গমোহনের চতুষ্পাঠীটি তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল। কারণ এ বাংলায় আসার পর চতুষ্পাঠীতে আর তিনি ছাত্র পেলেন না। সংস্কৃত পণ্ডিতের দাম্ভিকতার জন্য তাকে বহুবার বহুজায়গায় অবমাননার শিকার হতে হয়েছে। জীবনে যে জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি পথ চলা শুরু করেছিলেন সে জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে পেয়েছেন। তবে লড়াই ছাড়েননি তিনি। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মতেজ নিয়ে লড়াই করে গিয়েছেন। ধীরে ধীরে জীবন অনঙ্গমোহনকে যেদিকে নিয়ে গিয়েছে সেদিকেই বাঁক নিয়েছে। জীবন যে কতরকমভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত হয় তা প্রতিটি মানুষের জীবন ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে। অনঙ্গমোহনও জীবনের শেষ পর্যায়ে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে যে কোন বৃত্তিধারণ করতে হতে পারে সে বোধের সম্মুখীন হয়েছেন। এই ভাবেই তিনি জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছেন। এই জীবন তার চলমানতায় নানাভাবে উপস্থিত হয়। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী জীবনকে নানা ভাবে উপলব্ধি করেছেন। ছোটগল্পের মধ্যে আমরা 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসের বিষয় আগে লক্ষ করেছি। উপন্যাসের

মধ্যে সে পরিসর অন্যমাত্রা পেল। তাঁর প্রথম উপন্যাসে তিনি যেভাবে একটা ভগ্ন পরিস্থিতি তুলে ধরলেন তা নিপুণ দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

এরপর আলোচনার পরিসরে স্থান পাবে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'নবম পর্ব'। বিশ শতকের শেষ দশকে বিশ্বায়নের প্রভাবের প্রথমদিকে মানুষের সামাজিক স্তরে কোথায় কিরকম অবস্থান ঘটছে তার পরিচয় এই উপন্যাসে কীভাবে রয়েছে তা বিশেষণ করে দেখা হচ্ছে।

২

'নবমপর্ব' উপন্যাসটি ১৯৯৭ সালে জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে রয়েছে ২৫টি অধ্যায়। উপন্যাসের পটভূমি ওড়িষ্যার পাহাড়ি আদিবাসী জীবনের কাহিনি। উপন্যাসের কথক সোদপুরের বাসিন্দা কল্যাণ চক্রবর্তী। 'ডেইলি রেটেড' মজুরের কাজ নিয়ে সে ওড়িষ্যায় যায়। আর পাঁচটা বাঙালি যেমন ওড়িষ্যা বলতে পুরী, ভুবনেশ্বরের ধারণা পোষণ করে, সেরকমই ধারণা নিয়ে কল্যাণ উপস্থিত হয় ওড়িষ্যার কেওনঝর জেলায়। রেললাইনের মাপ দেওয়ার কাজে যারা যুক্ত তাদের ফরমায়েশ খাটা কল্যাণের কাজ। তবে দিনমজুর হিসেবে তাকে কাজ করতে হলেও কল্যাণ বি.এ. পাশ। কেওনঝর জেলার ভালুকগড়ি গ্রামে কল্যাণের মনিব চক্রবর্তী মহাশয় ও মহান্তি সাহেবের মেসবাড়ি এবং অফিস। রেলের জন্য জমি জরিপের কাজে তারা লিপ্ত। কল্যাণ তাদের ক্যাজুয়াল কর্মী। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী উপন্যাসের মধ্যে দুটি ধারাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এক, ওড়িষ্যার পাহাড়ী জনজাতির জীবনচর্যা এবং দুই, তাদের ওপর শোষণের চিত্র। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের বহু জায়গায় উঠে আসে কেওনঝর জেলার প্রান্তিক মানুষগুলির বিশ্বাস-আচার- সংস্কার। উপন্যাসের শুরু হয়েছে ঢেংকিকুটের হাটের চিত্র দিয়ে। হাটের সঙ্গে কল্যাণের পরিচয় বছর খানেকের। হাটে এসেই কল্যাণ জানতে পারে কলকাতা থেকে বহু ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করতে আসে। যে জিনিসের কলকাতায় মূল্য নেই সে জিনিস এখানে সাদরে বিক্রি হয়। ওড়িষ্যার বহু জনজাতির মধ্যে মুণ্ডা, ওরাওঁ, কোল, সাঁওতাল, জুয়াঙ্গ এই জনজাতিরর লোকেরা কেওনঝর জেলার যত্রতত্র ছড়িয়ে। কল্যাণ ওড়িষ্যার খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। সে জানতে পারে ঝিঙেকে জনহি, কাঁঠালের বীজকে পনসমঞ্জি, ধেতালু মানে কুমড়ো। প্রত্যেক জাতির খাদ্য সংস্কৃতি সেই জাতির পরিচয় বহন করে তা এই উপন্যাসেও ধরা পড়েছে। কল্যাণের সহৃদয় মন হাটের মাঝে হৈমবতী নামে এক মহিলার সারা গায়ে আঁচিল দেখে হোমিওপ্যাথি ওষুধে তা সেরে যাবে বলে উপদেশ দেয়। কিন্তু ভাষাগত পার্থক্যের জন্য কল্যাণ তার মনের ইচ্ছে বোঝাতে পারে

না। তবে ধীরে ধীরে কল্যাণ ওড়িষ্যার ভাষা বুঝতে ও অল্প অল্প বলতেও শিখেছে। কল্যাণের ভাষা বয়নে ঔপন্যাসিক একটা রৈখিক বিভেদ দেখিয়েছেন প্রথম থেকেই। কল্যাণের বোধ সাধারণ বৈষয়িক মানুষের বোধের থেকে আলাদা। সেই বোধ থেকেই ওড়িষ্যার জীবনালেখ্যকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। সখপুরা বাঁশপানি ব্রডগেজ প্রজেক্টের মাধ্যমে যে ডলার ইনকাম হবে তার 'ছোট্টশর্ত কল্যাণ'। তাই বাবুদের সব কাজে সঙ্গ দেওয়া তার কাজ। কারণ অন্ধ মায়ের জন্য তাকে সোদপুরে টাকা পাঠাতে হয়। ফলে জুয়াঙ্গদের সঙ্গে অফিসারদের অর্থনৈতিক পার্থক্য চোখে পড়লেও তাকে চুপ করে থাকতে হয়। সে ভাবে—

> *"সাহেবরা যখন মিটিং করেন, তখন টেবিলে থাকে বিসলারি জলের বোতল। বিসলারি বোতলের দাম এক একটা তের টাকা। ... জুয়াঙ্গ মেয়েরা দশ কিলোমিটার হেঁটে আসে মাথায় বনের কাঠের বোঝা বয়ে। এক বাণ্ডিল পাঁচ টাকা।"*[১৮]

কল্যাণ মনে করে বেকার হয়ে বসে থাকার চেয়ে ক্যাজুয়াল কর্মী হয়ে থাকাটা অনেক শান্তির। অন্ততপক্ষে কাজের মধ্যে তো থাকা যায়। উপরন্তু বিদেশের মাটিতে চাকরি করতে আসা। কল্যাণের কল্পনায় আসে— পাড়ার মধ্যে তার আলাদা সম্মান সে আদায় করবে। কিন্তু বাঙালি হয়েও কল্যাণকে মাঝে মধ্যেই অস্বস্তিতে পড়তে হয়। কারণ ওড়িষ্যার লোকেরা যতটা পশ্চিমবাংলাকে চর্চার মধ্যে রেখেছে বাঙালিরা সে জায়গা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলা জানা মদনমোহন মিশ্র সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। তিনি কালকূটের 'শাম্ব' পড়ছিলেন বাস স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষারত অবস্থায়। কল্যাণের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি কল্যাণকে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' কলকাতা থেকে এনে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কল্যাণ বাঙালি হয়েও এই সমস্ত বইপত্রের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। ওড়িয়া লোকেরা যে বাংলা ভাষাটা খুব সহজেই আয়ত্ত করতে পারে এবং তাদের যে একটা আগ্রহ রয়েছে সেটা কল্যাণ উপলব্ধি করেছে।

সময়টা নব্বইয়ের দশক। চারিদিকে মুনাফালোভীদের বাড়বাড়ন্ত। কল্যাণের কল্পনা পিপাসু মন ভালুগগড়ি, ডাঙ্গুয়াপশি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে থাকলেও সেদিকে নজর দেওয়ার মত সময় ছিল কম। মহান্তিবাবুর সেকেন্ডহ্যাণ্ড স্কুটারকে পুজো দিতে তারিণীমায়ের মন্দিরে চক্রবর্তীবাবু সহ তিনজন রওনা হয় স্কুটারেই। তারিণী মায়ের মন্দির যাওয়া মাত্রই মন্দিরের গায়ের চার্টরেট-এর চিত্র প্রমাণ করে ধর্মকে কেন্দ্র করে ব্যবসার রমরমা। সময়ের সঙ্গে ভক্তের এবং ভক্তির ধরনের পরিবর্তন পরিবির্তত মানসিকতাকে নির্দেশ করে। কল্যাণ লক্ষ করে একদল ভক্তর আগমন

চিত্র—

"হাজার হাজার ঢিলের সঙ্গে আরো একটা ঢিলও ঝুলবে। কি চাইবে কল্যাণ। ওর একটা ঠিক মতো চাকরি? ওই মেয়েটাকে চাইবে? মিনতি সাহা? ঢিলটা বাঁধে কল্যাণ। হে মা তারিণী, আমার মায়ের যেন ...। দেখা হ্যায় পেহলি বার সাজন কি আঁখো মে প্যার ...। মাইক বেজে ওঠে। একদল তীর্থ যাত্রী এসেছে লরি করে। কে জানে কোন সুদূর থেকে। লরিতে এনেছে মাইক।"[১৯]

কল্যাণ লক্ষ করে— দেবতার জয়গান নয় এখন সিনেমার জয়গান গাওয়া হয়। ওড়িষ্যার সংস্কৃতির মধ্যেও এই বিপর্যয় প্রবেশ করেছে। কম্পিউটার, ইন্টারনেটের যুগেও সেখানে ম্যালেরিয়ার ওষুধ না খেয়ে 'বান' মেরেছে কে— তার খোঁজে গুণিনের কাছে যাওয়ার চল শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও লক্ষ করেছে কল্যাণ। ভালুকগড়িতে হলুর চায়ের দোকানে কল্যাণের সঙ্গে অন্য যারা আড্ডা দেয় তারা প্রত্যেকে মাদকাসক্ত। গাঁজার সেবনে তারা ভবিষ্যৎকে নিয়ে ভাববার অবকাশ রাখে না। তারা আধুনিকতার ছোঁয়া নিতে ভালোবাসলেও প্রাচীন অন্ধ-বিশ্বাসকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়। সেই সুযোগের সৎ ব্যবহার করেন কল্যাণদের মেসবাড়ির মালিক ধলবাবু। যদুমণি গুণিনের নামে অন্ধ বিশ্বাস ছড়ানো তার কাজ। আসলে এটা প্রভুত্ব শক্তিকে বজায় রাখার একটা কৌশল মাত্র। কারণ ভলুকগড়িতে তাঁরই একমাত্র পাকাবাড়ি। ফলে প্রতিপত্তিশালী হওয়ার নেশায় তিনি কুকাজ করতেও পিছুপা হন না।

ডাংগুয়াপশির ওপর দিয়ে রেললাইনের মাপজোপ শুরু হয়। রেল ইঞ্জিনিয়র আগরওয়াল সাহেব মাপজোখ করতে এসেছেন। সীতাবিনজি গ্রামেই ডাংগুয়াপশি। ফলে সীতাবিনজির দীর্ঘদিনের মিথলজিক্যাল কাহিনি ধ্বংসের পথে। যে সীতা গ্রামের প্রতিটি অংশে জড়িয়ে, সে সীতা আজ আবার পরীক্ষার সম্মুখীন। সে তাঁর সম্মান রাখতে অপারগ। রামায়ণের লৌকিক কাহিনি— এ গাঁয়ের জনজাতির জীবনসঙ্গী। কিন্তু আগরওয়ালের মিথডোলাইট সমস্তকিছুকে তছনছ করে দিতে চলেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সরিয়ে কৃত্রিমভাবে সাজিয়ে পরবর্তীসময়ে সীতাবিনজিতে প্ল্যাটফর্ম তৈরির কথা ভাবে মুনাফা লোভী আগরওয়াল সাহেব। কারণ তাঁর কাছে সীতা আর রাম-রাবণের মিথ নিতান্তই লোকসৃষ্টি। ফলে ওড়িষ্যার লৌকিক যাত্রাপালা 'সীতা কান্দুচি গ্রাম ঘরে' সত্য রূপেই আজ প্রতিভাত হয়েছে লেখকের কলমে।

কল্যাণ লক্ষ করেছে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নিম্নবর্গীয়রা শোষিত হয় এবং তারা শোষিত হতেই ভালোবাসে। বেশি মুনাফা কী? সে বিষয়টাই তারা বোঝে না। ঢেংকিকুটের হাটে জ্যান্ত

শিঙ্গি আর মাগুর মাছ যেখানে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করতে পারবে সেখানে পাঁচটাকা ভাগা দেওয়ার জন্য মাছগুলি মেরে সাজিয়ে রাখছে তারা। কারণ এভাগের মাছ ওভাগে যেতে পারবে না। আর প্রতিটি ভাগ পাঁচটাকায় বিক্রি করতে পারবে। ঘটনাটি সামান্য হলেও ঔপন্যাসিক সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণমূলক ভাবে মানুষগুলির সরলতাকে উপন্যাসের এই জায়গায় উল্লেখ করেছেন। উপন্যাস কাহিনিতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত ঔপন্যাসিক ওড়িষ্যার জনজীবনের বহুচিত্র তুলে ধরেছেন। এরপর অন্যধারায় কাহিনির বাঁক বদল ঘটায়।

উপন্যাসের মধ্যে এতসময় সেরকম উপকাহিনীর সংযোগ দেখা যায়নি। কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতির আর্থ-রাজনৈতিক যোগের পরিচয় পাওয়া যায় সপ্তম অধ্যায় থেকে। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য মহান্তিবাবু পণের ব্যবস্থা করতে চান। সঙ্গে ডাংগুয়াপশি গ্রামে একটু জায়গার বন্দোবস্ত। কারণ এখানে প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলে ধীরে ধীরে নগরায়নের ছোঁয়ায় বহু মুনাফালাভ হতে পারে। সঙ্গে পরিবারকে কাছেও রাখা যায়। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ডাংগুয়াপশি গ্রামের বৈশিষ্ট্যকে একটু আলাদা করে তুলে ধরেছেন। বলেছেন— ডাংগুয়াপশি গ্রামে কোনো শাসন নেই ব্রাহ্মণ বা করণ জাতি গোষ্ঠীর। এখানে খণ্ডায়েত, তাঁতি, দলুই, বাগুতি জনজাতির বসবাস। ভলুকগড়ির থেকে অনেকাংশেই উপদ্রবহীন। তবে গ্রামের মধ্যে 'পল্টুদা' নামের ক্লাবের অস্তিত্ব পাঠককে একটানা তথ্য পরিবেশন থেকে মুক্তি দেয়। মহান্তিবাবু আর কল্যাণ ডাংগুয়াপশি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন। এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন— সত্যবন্ধ আর রানীবন্ধ দিঘির সামনের মাঠ যেখানে তারা রেললাইনের জন্য মাপ দিয়ে রেখেছে সেখানেই গ্রামের ছেলেমেয়ের খেলাধুলো প্র্যাকটিস করে। যে গ্রামে শিক্ষার আলো নেই, উঁচু জাত নেই, সেই গ্রামে একটা ক্লাবের রহস্য মহান্তিবাবু আঁচ করতে পারেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুনাফালোভী মন সাড়া দিয়ে ওঠে। বড় মেয়েটা খেলাধুলোয় জোর দিলে যদি একটা চাকরি জুটে যায় তবে বিয়েতে পণের টাকা কম লাগত। সঙ্গে স্কুটারের টাকাটাও জমিয়ে নিতে পারতেন।

উপন্যাসটির শ্লথগতির মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলক এসে লাগে কেওনঝরে রথের মেলার সময়। কেওনঝরের বিখ্যাত রথের মেলার আয়োজন। কল্যাণ রথের ছুটিতে বাড়ি যায়নি। রথের মেলার আনন্দ উপভোগ তার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। মিথ অনুযায়ী কেওনঝরের রাজা রথের সামনে ঝাট দিলে তবেই রথ চলবে। রাজা অনন্তনারায়ণ এসেছেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের ধারাবাহিকতাকে বহন করে রথ উৎসবের উদ্‌যাপন করলেন। লক্ষণীয়, এই মেলার মধ্যে কেওনঝর-আকাশবাণীর এক রিপোর্টারের সঙ্গে কল্যাণের আলাপ হয়। তিনি মেলার মধ্যে

ডকুমেন্টারি রেকর্ড করছিলেন। পল্টুদা ক্লাবের যে একটা বিশেষ ভূমিকা কেওনঝরে রয়েছে তা আবার এই মেলায় প্রমাণিত। পল্টুদা ক্লাবের ইলিশি জুয়াঙ্গ নামের একটি মেয়ের পোস্টারের নিচে লেখা 'উড়ন্ত বালিকা'। কিন্তু বাস্তবে মেয়েটিকে দেখা যায় আকন্দফুলের মালা বিক্রি করতে। সে নিজে জানে না যে তার একটি পোস্টার মেলার মধ্যে রয়েছে। কল্যাণ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারে সে নিজের জীবন ধারণের সম্বলটুকু জোগাড় করতে ব্যস্ত। কথার মধ্যে ইলিশির সরলতা আর খেলার জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। কল্যাণের সঙ্গে রেডিও সেন্টারের লোকটির আলাপ হয়। কল্যাণের জিজ্ঞাসু মনের আরো একটি দিকের উন্মোচন হয়ে যায়। রেডিও সেন্টারের লোকটির নাম শ্রীধর জেনা। তিনি দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন। ফলে বাংলা ভাষায় তাঁর দক্ষতা রয়েছে। ঘটনাক্রম এগিয়ে যায়, কল্যাণ হলুর চায়ের দোকানের আড্ডায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে— এসময়ের কেউই পল্টুদাকে দেখেনি, শুধুমাত্র ক্লাবের সেক্রেটারি সুরেন সেনাপতি আর গ্রামের এক প্রবীণ ব্যক্তি বিপিন মাহাতো ছাড়া। জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে জানা যায়, গ্রামের লোকগুলো খেলাধুলো করে চাকরির আশায়। অনেকে আবার প্রাইজ আর ভালো খাবারের আশায়ও প্র্যাকটিস করে। কেওনঝর রেডিও স্টেশনের শ্রীধর জেনা উপস্থিত হন গ্রামের এথলেটসদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কথাগুলো তিনি তাঁর রেকর্ড যন্ত্রে রেকর্ড করে নেন। ইলিশি জুয়াঙ্গর সঙ্গেও কথা বলেন। ইলিশির কাছ থেকে জানা যায় সে অন্তঃরাজ্য কম্পিটিশনে গিয়েছিল। কিন্তু একশ আর দু'শ মিটারে ফার্স্ট হলেও চার'শ মিটারে কিছুই হতে পারেনি। পাঠকের কারণ বুঝতে বাকি থাকে না, আসলে সঠিক পুষ্টির অভাবই তাঁর এই পথের অন্তরায়। তার জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, সে শুধু কম্পিটিশনে ফার্স্ট হতে চায় এবং 'সাই' ক্যাম্পে যেতে চায়। কারণ সেখানে ভালো খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া কোনো কাজ করতে হয় না।

ওড়িষ্যার যে অঞ্চলের লোকেদের কথা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন সেখানে উঁচু জাতের সঙ্গে নিচু জাতের জল-চলের সম্পর্ক নেই। কিন্তু পল্টুদা ক্লাব সেই বিভেদকে মিটিয়ে দিয়েছে। কে এই পল্টুদা? কল্যাণের মধ্যে প্রশ্ন জাগে। পল্টুদাকে কেউ জানে না। শুধু জানে পল্টুদা পাথর ভাঙার কাজ নিয়ে এলাকায় এসে ডাংগুপশির মানুষদের মধ্যে পরিশ্রম করার শক্তিকে লক্ষ করেছিলেন। লক্ষ করেছিলেন, জোড়া দিঘি আর বিশাল মাঠ। আর নিজের মধ্যে ছিল স্পোর্টসম্যানশিপ। একটা ধারণা থেকে পল্টুদা গ্রামের লোকগুলির সঙ্গে মিশেছে, খেলাধুলোয় উৎসাহ দিয়েছে, ফলে গ্রামের লোকেরা তার কাছ থেকে পেয়েছে অনেক কিছু। গ্রামের কয়েকজনের চাকরি হলে গ্রামের নকশাটার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তবে পল্টুদা এক সময় চলে গেলেও পল্টুদার সৃষ্টি ক্লাবটি রয়ে যায় তার

পরিশ্রমের ফল হিসেবে।

উপন্যাসে সম্পূর্ণ অংশেই 'ভয়েসলেশ' মানুষদের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। এ সময়কালে সমস্ত জনজাতিকে এক ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলেছে রাষ্ট্রের তরফ থেকে। একদিকে সমগ্র দেশ জুড়ে সাক্ষরতা অভিযান চলছে, অন্যদিকে ওড়িষ্যার এমন এক প্রান্তিক এলাকার কথা উপন্যাসে উঠে এলো যার মধ্যে দেখা যায় বাঙালি জনমানসের ও শোষণের একটি চিত্র। দেখা যায়, যখন জঙ্গল মহল নিয়ে নানারকম আন্দোলন চলছে সে সময়ে জঙ্গলমহলের আদিবাসী সন্তান ঈশ্বর তাদের জনজাতি হেম্ব্রমবাবুর দ্বারা শোষিত। আসলে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা শোষণের ধরণ বুঝতে পারে না । পারে না নিজের রুজি-রোজগারের সঠিক মূল্য সম্পর্কে বিচার করতে। সহজে যে কোনো প্রলোভনে তারা সাড়া দেয়। বোঝেনা তারা যে আখেরে ক্ষতি তাদেরই। কল্যাণও ভয়েসলেশ মানুষগুলোর অংশ। তবে উপন্যাসের প্রায় মাঝ পর্বে এসে কল্যাণ বুঝতে পারে এতদিন সে শোষিত হয়ে এসেছে। আসলে তাকে চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ফলে মহান্তি আর চক্রবর্তীবাবুর সমস্ত কথাই সে শুনে এসেছে। একসময় মুনাফালোভী মহান্তিবাবু চক্রবর্তী সাহেবের বদলির পরই কল্যাণকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। পল্টুদা ক্লাবের সুরেন সেনাপতিকে তার জায়গায় কাজে বহাল রাখেন। কারণ সুরেনকে হাত করতে পারলেই তো খেলার মাঠের ওপর দিয়ে রেললাইন হওয়ার কোনো বাধা থাকবে না। উপরন্তু ডাংগুয়াপশিতে সুরেনের কাছ থেকে জায়গার বন্দোবস্তটাও হয়ে যাবে। তিনি হেডক্লার্ক, তিনি যা ব্যবস্থা নেবেন তাই মেনে নিতে হবে কল্যাণকে। শোষকের চেহারার আদ্যোপান্ত কল্যাণের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। কেওনঝর রেডিও সেন্টারের শ্রীধর জেনার ওপর কল্যাণের ভরসা ছিল। কিন্তু কল্যাণের সে আশাটুকুও এক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কারণ শ্রীধর জেনা জুয়াঙ্গ জনজাতিদের দুঃখ-কষ্ট, তাদের সরলতাকে রেকর্ড করে কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজটা পাওয়ার জন্য। তাদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি থেকে নয়। কল্যাণের চাকরি যাওয়ার কিছুদিন পর জনার্দনের বাড়িতে সে ভাড়া ছিল। কিন্তু এক সময় তিনি উঠিয়ে দিলে শ্রীধর জেনাই তার আশ্রয়দাতা হয়ে ওঠে। ফলে আবার মুখ বুজে সব সহ্য করা। আসলে কল্যাণের করুণ ও সহানুভূতিশীল মন ডাংগুয়াপশির সরল মানুষগুলোর জন্য কাঁদে। কিন্তু কিছু করার তার উপায় নেই। কল্যাণের মধ্যে জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে— 'মানুষ মানুষের জন্য' উক্তিটি কী মিথ্যে? এই প্রশ্নের উত্তর সে পায় না। কল্যাণ মেনে নেয় জীবনের চলমানতাকে। আসলে শোষকশ্রেণীর মানুষগুলোই তো কল্যাণের চাকরির ধারক এবং বাহক। ফলে প্রকৃতিপিপাসু মন নিয়েও হেমব্রমবাবুর পাথর ভাঙ্গার কাজে যোগ দিতে হয় তাকে। কারণ বাড়িতে টাকা পাঠানো ছাড়াও মিনতি সাহাকে

নিয়ে কল্যাণের যে আলাদা স্বপ্নের জগৎ আছে। যেখানে সে সরকারি চাকুরে হয়ে মিনতিকে দেখাতে পারে সে তার যোগ্য কিনা।

পাথর ভাঙার কাজে যুক্ত হয়ে কল্যাণ আরো অনেক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়। তার মনে তৈরি হয় ধরণীধর আর আম্ববতীর গল্পের প্লট। যুক্ত হয় ইলিশির কথা। দু'মুঠো ভাতের জন্য মেয়েটি দৌড়োয়। বাবা মারা যাওয়া মেয়েটির আত্মরক্ষার সহায়ক সারা গায়ের আঁচিল। কিন্তু তাতে কি! মেয়েটিকে নিয়েই শুরু হয় পলিটিক্যাল চাপান উতোর। তার উপর চাপ দেওয়া হয় ফার্স্ট না হওয়ার জন্য। কারণ রেলের ভূমি বন্দোবস্তের ক্লার্ক মহান্তিবাবুর মেয়ে মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা যাতে ফার্স্ট হয় সে ব্যবস্থাকে পাকা করেন মহান্তিবাবু স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের উপরের অফিসারদের হাত করে। এমনকি, কীভাবে জুয়াঙ্গ মেয়েটি আর তার ভাইকে ভিটে ছাড়া করা যায় সে ব্যবস্থাও পাকা করেন। কল্যাণের সহানুভূতিপ্রবণ মন বিষয়টি কিছুটা আঁচ করে। তাই ইলিশির জন্য চক্রবর্তী সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে রাখা আঁচিলের ওষুধ গোপনে তাকে দেয় এবং খাওয়ার নিয়মও বুঝিয়ে দেয়। কল্যাণ বোঝে শ্রীধরবাবুও ইলিশির জন্য কিছু করতে পারবেন না। তিনিও তো মুনাফালোভী আশ্রয়দাতা। রেডিও স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় কল্যাণের ওপর চাপও বাড়ে। কারণ কথায় কথায় কল্যাণকেই বাংলা সাহিত্যের সব ইনফরমেশন দিতে হয়, যার সিকিভাগও কল্যাণের জানা নেই। উপন্যাসের কাহিনি শেষ পর্বের দিকে এগোতে থাকে শ্রীধর জেনার জীবন কাহিনিকে কেন্দ্র করে। উনিশশ' সত্তর সাল থেকে শ্রীধর জেনার কলকাতা জীবনের কাহিনি এবং পরবর্তীসময়ে আই.এস. অফিসার হওয়ার ঘটনা সত্যিই রোমাঞ্চকর। কল্যাণের সঙ্গে শ্রীধর কলকাতায় যান। সেখানে পূর্বস্মৃতি সঞ্চয় করতে গিয়ে পল্টুদার সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়। পল্টুদা ক্লাবের ইতিহাস নিয়ে কথা বলে। এসবের মধ্যে জানা যায় পল্টুদা ওড়িষ্যার পাথর ভাঙার কাজের পর কলকাতায় আসেন টিভির বিজ্ঞাপন তৈরির কাজ নিয়ে। এরপর নিজের 'স্পার্ক প্রোডাকশন' তৈরি করা এবং বিভিন্ন টিভি সিরিয়ালের কাজ পাওয়ার মধ্য দিয়ে তার জীবন এগিয়েছে। বর্তমানে ন্যাশনাল চ্যানেলের জন্য 'উয়োমেন ইন ইণ্ডিয়া' নামে ১৩টি এপিসোডের একটা সিরিয়াল তৈরি করেন। যার 'নবম পর্ব' টা এখনো বাকি। কথাসূত্রে শ্রীধর জেনা নিজের গল্প নিয়ে পল্টুদার সঙ্গে কাজ করতে চান। কিন্তু পল্টুদা ইলিশির গল্প নিয়ে 'নবম পর্ব' টা শুট করতে চান। যেখানে তিনি দেখাতে পারবেন একটি নিম্নশ্রেণির মেয়ে ছুটছে যার কোনো উদ্দেশ্য নেই। ফলে তার সমাজ তাকে মেনে নিচ্ছে না, তার বিয়ে হচ্ছে না। এপিসোডটা 'দি ভিলেজ অফ এ্যথলেটস' নাম দেওয়া হবে এবং মূল সিরিয়ালের একটা পর্বও কভার হবে। তৈরি হবে ন্যাশনাল চ্যানেলের 'নাইন্থ এপিসোড'।

কল্যাণ সম্পূর্ণ ব্যাপারটা শুধু পর্যবেক্ষণ করতে থাকে আর পল্টুদার আদর্শ বদলের ইতিহাসকে কল্পনার জালে আনার চেষ্টা করে। কল্যাণ জীবন জিজ্ঞাসার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে তার মনে হয়— জীবনের উদ্দেশ্য কী শুধুই স্বার্থ সিদ্ধি করা? কারণ, পল্টুদার মধ্যেও দেখা যায় মুনাফালোভী সত্তা। পল্টুদা সঙ্গে শ্রীধর জেনা আর কল্যাণকে নিজের গাড়িতে নিয়ে কেওনঝরে পৌঁছান। তাঁদের পৌঁছানোর খবর ডাংগুয়াপশি গ্রামের মানুষদের কাছে ঈশ্বর দর্শনের মতো। তারা তাদের হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে পল্টুদাকে আপ্যায়ন করতে চাইলেও ব্যবসায়ী পল্টুদার কাছে এসবের গুরুত্ব সামান্যই। তিনি ব্যস্ত হন ইলিশিকে নিয়ে শ্যুট্ করতে। সুরেন সেনাপতির সঙ্গে দেখা হলে জানা যায় গ্রামের হালচাল। মহান্তিবাবুর মেয়ে মহাশ্বেতাকে সাই ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য 'পলিটিক্সের ডাকিনি' তাদের গ্রামটাকে কীভাবে তছনছ করে দেবে তার কথা। গ্রামের প্রচলিত অন্ধ-বিশ্বাসের দরুণ গ্রামের মধ্যে ঘটে যাওয়া কয়েকটি অশুভ ঘটনা সবার মনের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে যে, সত্যিই গ্রামে 'ডাকিনি' এসেছে। সুরেন এও বুঝতে পারে, এই 'ডাকিনির গ্রাস' ইলিশিকেও ছাড়বে না। ফলে পল্টুদার ইলিশিকে নিয়ে টিভির শোয়ের জন্য শ্যুট্ করাকে সুরেন 'ডাকিনি' আসার ফল হিসেবেই দেখছে। কারণ সুরেনের চোখেও ধরা পড়েছে পল্টুদার বর্তমান রূপের পরিবর্তন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনি ইলিশি জুয়াঙ্গাকে নিয়ে। ইলিশির কথা শ্যুট করার সময় সে সরল ভাবেই উত্তর দিয়েছে। সে সাই ক্যাম্পে যেতে চায়। কারণ, সেখানে কোনো কাজ না করেই দু'বেলা খাওয়ার জোটে। কিন্তু বাবুদের মেয়ে থাকতে তার যাওয়া সম্ভব নয়। ইলিশির বাড়ির ছবি, উইলাগা সার্টিফিকেট, ট্রফি, মাঠে প্রাক্টিস সবই ক্যামেরা বন্দি হয়। তৈরি হবে 'নবম পর্ব'। ইলিশির পরে গ্রামে অন্যান্য এ্যাথলেটসদের খেলাধুলো শ্যুট্ করা হয়। পরের দিন ঢেংকিকুটের হাটে সেখানকার বিচিত্র বিষয়ও ক্যামেরা বন্দি হয়। বাদ যায় না কুসংস্কারে বশবর্তী হয়ে সারা হাটের মধ্যে সবার নজর কাড়ার চেষ্টা ও তাদের ভণ্ডামি। তান্ত্রিকেরা ডাকিনিকে খুঁজে বের করে আনার ফন্দি আঁটে। হাটের মধ্যেই তার অবস্থান এ বিষয়টি তারা প্রমাণও করতে চায়। কিন্তু সবার সামনে তা প্রমাণ করতে তারা অক্ষম। পল্টুদা বিষয়টি নিয়ে উৎসাহী, যদি ডাকিনিকে ধরার বিষয়টি শ্যুট্ করতে পারেন তবে তার ফিচারের মূল্য অনেকগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু ডাংগুয়াপশির 'উড়ন্ত বালিকা'ই যে ডাকিনি বলে প্রমাণিত হবে তা কে জানত। রাতের অন্ধকারে তাই সুরেন সেনাপতি ইলিশিকে নিয়ে হাজির হয় কল্যাণের কাছে। 'পলিটিক্সের ডাকিনি' যে ইলিশিকেই ডাকিনি করে তুলবে সে বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সুরেনের স্পোর্টসম্যান হৃদয় ইলিশিকে বাঁচাতে চায়। সুরেন

ইলিশিকে সকলের নজর বাঁচিয়ে নিয়ে এলেও কল্যাণ 'যন্ত্র ডাকিনি'র হাত থেকে কী করে তাকে বাঁচাবে ? তাই ইলিশিকে বাঁচানোর তাগিদে কল্যাণ শ্রীধরের স্কুটার নিয়ে পেছনে ইলিশিকে বসিয়ে ছুটতে শুরু করে। জীবনের সমস্ত খেলার অবসান হলেও চলমানতা নিস্তার দেয় না। অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু হয় কল্যাণের। আর হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে ইলিশির শুয়ে থাকা দৃশ্যের শ্যুট্ হতে থাকে। ক্যামেরা ঘুরতে থাকে 'উয়োমেন ইন ইন্ডিয়া'-র 'নবম পর্ব'-র জন্য। প্রেজেন্ট হয় ন্যাশনাল টিভিতে। যার কোন অংশেই কোনো ভূমিকা নেই, ভূমিকা থাকে না কল্যাণের মতো আবেগপ্রবণ মানুষের। শোষক আর শোষিত মানুষগুলির মাঝে শোষিত মানুষগুলিকে যারা উদ্ধার করতে যায় তাদের নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। উপন্যাসের মধ্যে কল্যাণ তার উদাহরণ হয়ে রইল। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ভালোবাসেন গবেষণা লব্ধ বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখতে। 'নবম পর্ব' তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াস। এখানে তাঁর বাস্তবের অভিজ্ঞতালব্ধ ভাবনার যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মানবজীবন বহু ভাবে তার যাত্রাপথ নির্মাণ করে; 'নবম পর্ব' তার একটি উদাহরণ। আর ওড়িষ্যার জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনি তার প্রমাণ।

উপন্যাসে স্বপ্নময় চক্রবর্তী কল্যাণের মধ্য দিয়ে ওড়িষ্যার একটি অঞ্চলের জীবন-চর্যাকে ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে দু'ধরনের চরিত্রেরা ভিড় করেছে। একদিকে শোষক শ্রেণি অন্যদিকে মুনাফালোভী শ্রেণি। শোষক শ্রেণির মধ্যে মহান্তিবাবু, কার্তিক ধল, মঙ্গল হেমব্রমের মতো চরিত্ররা। আর মুনাফালোভী শ্রেণি শ্রীধর জেনা, পল্টুদা, আগরওয়াল সাহেব। সমগ্র কেওনঝর অঞ্চলের কয়েকটি প্রান্তিক অঞ্চলের জন-জীবনের চিত্র লেখক পর্যবেক্ষণমূলক তথ্যের ভিত্তিতে উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে ওড়িষ্যার সাহিত্যিক বর্গের পরিচিতি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা যে ওড়িয়া সাহিত্য- সংস্কৃতিতে বিশেষ মর্যাদায় গ্রহণ করা হয়েছে তার উল্লেখও রয়েছে উপন্যাসে। বহু বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা এবং ওড়িয়া সংস্কৃতির প্রাচীনতা যে বিনাশের পথে সে ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক বহু অংশেই তুলে ধরেছেন। বাঙালি আর ওড়িয়া সংস্কৃতির বহু জায়গায় যে মিল রয়েছে তারও চিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তী এঁকেছেন। ইলিশি জুয়াঙ্গকে নিয়ে উপন্যাসটিতে একটি রোমান্টিক আখ্যান তৈরি হতে পারত। কিন্তু ঔপন্যাসিক সে দিকে মন দেননি। অন্যদিকে কল্যাণের মিনতি সাহাকে নিয়ে খণ্ড ক্ষুদ্র কল্পনাবিলাসিতাও হয়ে উঠতে পারত মূল কাহিনির টার্ণিং পয়েন্ট। কিন্তু ঔপন্যাসিক সেখানেও কাহিনিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করার দিকে মন দেননি। আসলে লেখক সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চমককে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। যে জীবন বাঙালি পাঠকের কাছে অচেনা সেই জীবনের রূপকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। জীবন যে কত বিচিত্র তার

রূপ এই উপন্যাসে রয়েছে। সঙ্গে কল্যাণের মতো মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার নিরসন হওয়ার আগেই তার জীবনে নেমে আসতে পারে বিপর্যয়— সে ইঙ্গিত স্বপ্নময় চক্রবর্তী দিয়েছেন। কীভাবে নিম্ন শ্রেণির মানুষদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করে শোষক শ্রেণির মানুষেরা তার উদাহরণ উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপটে রয়েছে। ফলে সামগ্রিক বাঁধাধরা কাহিনির বদলে 'নবম পর্ব' হয়ে উঠেছে সামাজিক দলিল। তবে উপন্যাসের মধ্যে খুব ছোট ছোট গল্প উঠে এসেছে, যা উপন্যাসের বহুমাত্রিক বিষয়কে পরিপুষ্টি দান করেছে। যেমন— মদনমোহন মিশ্রের বাংলা শেখার গল্প, ধনুজনারায়ণের রাজা হওয়ার গল্প, পল্টুদাকে নিয়ে কাল্পনিক ভাবনা, ঈশ্বর নামের আদিবাসী ছেলের সাক্ষরতা অভিযানের এবং তার উপর হয়ে যাওয়া শোষণের গল্প, ইলিশির মা বাবা যথাক্রমে কস্তুরি ও কুলা (কল্যাণের দেওয়া নাম)-র বিয়ের এবং অন্যগ্রামে পালিয়ে যাওয়ার গল্প, ফকিরমোহন ও ধরণীধর আর আম্ববতীর গল্প, জনার্দনের পূর্ব পুরুষের গল্প। প্রতিটি কাহিনি এবং তার চরিত্রগুলি গভীর জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছে।

উপন্যাসটিতে কাহিনি পরিবেশনের ভঙ্গিতে লেখক মাঝে মধ্যেই চমক দিয়েছেন এযুগের চিন্তাধারায় ছেদ এনে। আসলে উপন্যাসের পটভূমি বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক। ফলে সে সময় কম্পিউটার আর ইন্টারনেট পরিষেবা প্রায় জায়গাতেই অগ্রগতির ধারক ও বাহক হয়েছে। কিন্তু কিছু জায়গায় এমন চিত্রের সম্মুখীন হতে হয়েছে যেখানে প্রাচীন আর নব্য সংস্কৃতির সরলরৈখিক অবস্থান। বাদ যায়নি ওড়িষ্যার নবজাগরণের প্রসঙ্গও। তবে যে চৈতন্যদেব বাঙালি জাতির প্রাণকেন্দ্র, সেই চৈতন্যদেব সম্পর্কে ওড়িষ্যার কূটনৈতিক মহলের বক্তব্য— চৈতন্য এসে জাতিটাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। এই ধরনের বিরূপ মন্তব্যের প্রচলন রয়েছে সেখানে। ফলে ওড়িষ্যার নবজাগরণের পথিক ও সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত মধুসূদন দাস, গোপবন্ধু, নীলকণ্ঠবাবু বা বিপ্লবী হাড়িবন্ধু পাণ্ডা বা সানন্দ গোঁসাই এদের নামে 'পল্টুদা ক্লাব'-এর নতুন নামকরণের প্রস্তাব আসে। কিন্তু হৃদয় দিয়ে পল্টুদার গুরুত্ব শুধু বুঝতে পারে সুরেন সেনাপতি। তাই প্রতিবাদের স্বর জোরালো করতে তার দ্বিধা হয় না—

> *"সুরেন সেনাপতি একটু উশখুশ করছিল। কিছু বলতে চায়, কিন্তু অনধিকার চর্চা হয়ে যায়। মহান্তিবাবু যখন শুধু রেলের লোক ছিল, তখন তার সঙ্গে যেভাবে কথা বলা যেত, এখন বস হওয়ায় বসের সঙ্গে সে ভাবে বলা যায় না; তবু সুরেন বেশ জোর দিয়েই বলল না— না। পল্টু দা ক্লাব, নাম পাল্টানো যায় না।"*[২০]

‘ভয়েসলেশ মাস’-এরাও কখনো কখনো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে তার প্রমাণ সুরেন সেনাপতি। তবে উপন্যাসের মধ্যে সুরেন ছাড়া অন্য নিম্নবর্গীয়দের তেমনভাবে বিবেকবোধের উদয় হতে দেখা যায়নি।

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বহুভাবে যৌন শোষণকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখা সাহিত্যে। ‘নবম পর্ব’ও বাদ যায়নি। কয়েকটি জায়গায় সে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে পুরুষদের ওপরও যে যৌন অত্যাচার হয় তার প্রমাণ শ্রীধর জেনার জীবন-অভিজ্ঞতা। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সরলতা, ত্যাগ এবং শোষিত হওয়ার প্রবণতার ছাপ প্রায়ই দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সব মিলিয়ে উপন্যাসটির পরিমণ্ডল বহু বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতাকে নিয়ে, বহু সম্ভাবনাময় কাহিনি সংযোজনের সুযোগ থাকলেও ঔপন্যাসিকের ভিন্ন জীবন-চর্যাকে তুলে ধরার মানসিকতাই উপন্যাসটিকে আলাদা মাত্রা দিয়ে যায়। যেখানে কল্যাণের মধ্য দিয়ে অসহায় মানুষগুলির জীবন দর্শনকে ঔপন্যাসিক নান্দনিক দৃষ্টিতেই তুলে ধরেছেন। কল্যাণের জীবন জিজ্ঞাসার নিষ্পত্তি ঘটেনি তার মৃত্যুর কারণে। তবে উপন্যাসের মধ্যে অসহায়, সাধারণ মানুষগুলির জীবন-যাপনের চিত্র এটাই প্রমাণ করে যে যুগ বদলায়, সঙ্গে শোষক চরিত্রও বদলায়। স্বার্থলোলুপ মানুষগুলির মাঝে সুরেন সেনাপতি, কল্যাণের মতো মানুষগুলোই আসলে সমাজের চলমানতার ধারক ও বাহক। মানবতাবোধ মানুষের প্রধান ধর্ম। সে জায়গাটাকে ধরে রাখাই প্রধান কর্তব্য। কল্যাণ চেষ্টা করেছে, সুরেনও চেষ্টা করেছে। এই চলমানতাই জীবন সম্পর্কে এরূপ ধারণার জন্ম দেয় যে— নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের ধর্ম। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী নব্বইয়ের দশকে এই উপন্যাস রচনা করলেন বাংলার বাইরের পটভূমিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বাংলা আর ওড়িষ্যার মানুষের জীবনের মূল স্রোত যে এক সূত্রে বাঁধা সে বিষয়টি উপন্যাসের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যায়। আসলে মানুষের জীবন কথা বর্ণনা তাঁর ধর্ম, তাঁর ক্ষেত্র। যুগ এবং জীবনের চিত্র আঁকতে বসে মানুষের আত্মদ্বন্দ্বের চিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তী আঁকেন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী জীবনের বহুবিচিত্র রূপকে তুলে ধরেন এবং সেই সব জীবনের নানা জিজ্ঞাসা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করেন। এই নব্বই-এর দশকে তিনি এরকমই আর একটি উপন্যাস রচনা করলেন যার মধ্যে ছিন্নমূল মানুষের নতুন বাস্তুভিটা ও তার পরবর্তী অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। আমরা তাঁর ‘বাস্তুকথা’ উপন্যাসের আলোচনায় অগ্রসর হব।

৩

'বাস্তুকথা' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলায় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। উপন্যাসটির বিষয় বাস্তু সমস্যার কবলে আক্রান্ত এক পরিবারের আত্মদ্বন্দ্বের কাহিনী। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শশাঙ্কবাবু। তাঁর পরিবারে দুই পুত্র বিতান এবং বাদল আর পুত্রবধূ বনানী। বিতান-বনানীর বিয়ের বয়স চার মাস। এছাড়া শশাঙ্কবাবুর দুই মেয়ে শম্পা ও টুম্পা। বড় মেয়ে শম্পার বিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনী ধারায় বিতান, বিতানের প্রেমিকা রুবি, বনানী এবং শশাঙ্কবাবুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শশাঙ্কবাবু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে স্কুলমাস্টারি ছেড়ে এক বস্ত্রে চলে আসেন। সেখানকার ভিটেমাটি বিক্রি করে টাকা পাঠান শশাঙ্কবাবুর স্কুলের হেডমাস্টার সামসুদ্দিন সাহেব। শশাঙ্কবাবু সেই টাকায় কলোনির জীবনকে ছেড়ে দূরে মফঃস্বল হৃদয়পুরে জমি কিনে বাড়ি এবং মনের মতো করে বাগান তৈরি করেন । কিন্তু এক সময় শশাঙ্কবাবু আত্মীয়ের জমির 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী' নিয়ে জমি মাফিয়াদের কবলে পড়ে যান। ফলে পিতাকে নিয়ে বিতানের যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বিতানের স্ত্রী বনানী পতি-অনুগতা। শ্বশুর মহাশয়ের সেবা শুশ্রূষা করতে পারদর্শী। পতি সেবাতেও সে পারঙ্গম। আসলে স্বামী বিতান বনানীকে বিনা পণে বিয়ে করে তার উদারতা এবং সচেতনতার গুণকে জাহির করে বারবার। বনানী এম.এ., বি.এড. হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চা সেভাবে করেনি। সে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে। ফলে জ্ঞানের বড়াই করা স্বামীর কাছে বনানীকে নত হয়েই থাকতে হয়। কিন্তু বহু সংবেদনশীল জায়গায় বনানী মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে। বিতান একসময় বিমানবন্দরের আবহাওয়া দপ্তরের চাকরি হারায় গাফিলতির দরুণ। বিমান দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণ সংশয় হয়। প্রবল অস্তিত্বের সংকটে পড়ে বিতান। ভিটে বাড়ি নিয়ে সমস্যা পিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। অন্যদিকে গাফিলতির জন্য কর্মহীনতা তাকে প্রবল দোলাচলতায় ফেলে দেয়। এরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে বিতানের পূর্ব প্রেমিকা রুবির আগমন। বনানী আর বিতানের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। রুবি বড়োলোক বাড়ির বউ। তার স্বামী শিল্পপতি। স্ত্রীর গতিবিধির উপর তার তেমন নজর নেই। অন্যদিকে রুবি জানে তার স্বামী বহুগামী, ফলে সেও এই বিষয়ে মাথা ঘামায় না। রুবি আর বিতানের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। রুবি শশাঙ্কবাবুর ভিটে বাস্তু জমি কিনে নিয়ে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করে। ইতিপূর্বে পরিবারের সদস্যদের শশাঙ্কবাবুর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পাওয়ায় তিনি অপমানিত বোধ করেন এবং বেছে নেন আত্মহত্যার পথ। কিন্তু প্রাণ না গেলেও হাতটি হারিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। বনানী শ্বশুরের সেবায় মনোযোগী হয় এবং জীবনের একপ্রান্ত থেকে উদ্বাস্তু হওয়ার আশঙ্কায় সময় বয়ে যেতে

থাকে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই বাস্তু খোঁজার চেষ্টা করে। আসলে মানুষ বহুভাবে বাস্তুহারা হয়, সেই গল্পই 'বাস্তুকথা' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু।

উপন্যাসে প্রধান চরিত্রের মধ্যে নিজের 'বাস্তুকথা'র বিবরণ রয়েছে। ফলে 'বাস্তুকথা' উপন্যাসের শশাঙ্কবাবুর বাস্তুহারা জীবনের কাহিনি দিয়ে শুরু হয়। সে কাহিনি আত্মজীবনীতে তিনি লিখে রেখে যেতে চান। সে কাহিনি অনেক সময়ই পুত্রবধূ বনানীকে দিয়ে লিখিয়ে নেন। মাত্র চার মাসের সংসার জীবন বনানীর। এই সময়পর্বের মধ্যে শ্বশুরবাড়িতে বনানীর একটা ছকে বাঁধা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। শ্বশুর মহাশয়, দেবর, ননদ, স্বামী এই চারটি প্রাণীর কাছে সে তার অবস্থান বুঝে নিয়েছে। দেবর বা ননদের কাছে সে খুব একটা সমাদরের জায়গা পায়নি। এমনকি, স্বামী বিতানও তার সরলতার জায়গাটা অনুভব করতে পারেনি। ফলে বারবার সে অপমানিত হয়েছে। কিন্তু শশাঙ্কবাবু অনুভব করেছেন বনানীই বৃদ্ধবয়সে তাঁর যথার্থ আশ্রয়স্থল। তাই বনানীকে তিনি যেমন মনের কথা বলতে পারেন, তেমনি আত্মজীবনী লেখার দায়ভারও তার ওপর দিতে ভরসা পান। প্রকৃত অর্থে জীবনযাত্রার প্রবহমানতায় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বহু পরিবর্তন হয়। নতুন সমস্যা নতুন ভাবনার সঞ্চার হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শশাঙ্কবাবু একা হয়ে পড়েন। সেই একাকিত্ব কাটানোর জন্য শশাঙ্কবাবু আশ্রয় নেন তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের দেওয়া জমির 'পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী'-র দায়িত্বের। কিন্তু এই দায়িত্ব নিতে গিয়ে তিনি জমির দালালি চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েন। জমির ব্রোকার সুধীরবাবু একই দলিলে দুবার সই করিয়ে শশাঙ্কবাবুর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির পথে হেঁটেছেন। শশাঙ্কবাবুর টাকার প্রয়োজনীয়তা সুধীরবাবুর চালাকিকে আমল দেয়নি। ফলে তিনি জটিল চক্রান্তের শিকার হন ।

বাড়িতে তাঁর কৃতকর্মের কথা জানাজানি হয়ে যায়। দুই পুত্র বিতান এবং বাদল আর পুত্রবধূ বনানীর কাছে পূর্ব শ্রদ্ধাশীল মানসিকতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা শশাঙ্কবাবুকে গ্রাস করে। এক হীনমন্যতাবোধে তিনি আক্রান্ত হন। উপন্যাসের শুরুতে পাঠক শশাঙ্কবাবুর মানসিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়। তিনি এক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি। পূর্ববঙ্গ থেকে এপার বাংলায় আসার পর তাঁর কলোনী জীবন-যাপন। সেখানে দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বনগাঁ স্টেশন থেকে দশ মিনিট রিকশা দূরত্বে হৃদয়পুরে আড়াই বিঘা জমি কিনে পুকুর, বাগান এবং বসত বাড়ি তৈরি করে তিনি বাস্তুকে স্থায়ী করেন। পূর্ব-বাংলার দেশের বাড়ির আদলে বাগান তৈরি করে মনের ইচ্ছেকে পূরণ করেন। স্কুলমাস্টারি থেকে রিটায়ার করে তার অভিজ্ঞতা আত্মজীবনীর খাতায় লিপিবদ্ধ করে তিনি জীবনের মূল্য নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। তিনি দায়িত্ববান

পিতা। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বিনা পণে ছেলের বউকে বাড়িতে তুলেছেন। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। বউমার সঙ্গে আধুনিক মনস্কতার পরিচয় দিয়ে মেলামেশা করেছেন। সবই নিয়মমাফিক চলছিল। কিন্তু টাকার প্রয়োজনীয়তা এক সময় তাকে আদর্শচ্যুত করল। জমির ব্রোকারের ফাঁদ তাঁর সারাজীবনের মূল্যবোধকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দিল নিজেরই অজান্তে; বরং বলা চলে নিজের গাফিলতিতে। বাড়ির প্রত্যেকের তাঁকে ঘিরে মানসিকতার বদল তিনি অনুভব করেছেন। ফলে রোজদিনের পাওনাদারদের তাগিদ, সঙ্গে বিতানের প্রশ্নবাণ, শশাঙ্কবাবুর মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলে। আসলে বিতান বিয়ের সময় বিনা পণে বিয়ে করতে চাইলেও বিয়ের খরচা বাবদ মাত্র পাঁচ হাজার টাকা হাতে দিয়েছিল। শশাঙ্কবাবু বাকি পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করেন। বিয়ের খরচ কোথা থেকে এলো সে প্রশ্ন করা প্রয়োজন মনে করেনি বিতান। অন্যদিকে বহুদিন থেকেই শশাঙ্কবাবুর জমির ব্রোকার সুধীরবাবুর সঙ্গে মেলামেশা। তার দেওয়া টাকা শশাঙ্কবাবুর নিতে কোনো অসুবিধা না হওয়ায় তাকে বর্তমানের দিন দেখতে হয়। তিনি বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি ছিলেন। ওপার বাংলা ত্যাগ করে এপার বাংলায় নিজের সম্বলে বাস্তুবাড়ি, বাগান, পুকুর সবই তৈরি করলেন। উপভোগ করতে চাইলেন তাঁর দেশের বাড়ির জীবন-যাপন। সব অঙ্কই ঠিকঠাক চলছিল। বাস্তুহারা মানুষটি তাঁর নতুন বাস্তু তৈরি করে জীবনের মূল্যমান নির্মাণ করতে বসেছিলেন। কিন্তু কীভাবে তিনি দালাল চক্রে পড়ে গেলেন তা বুঝতে তাঁর দেরিই হল বটে। আসলে টাকা মানুষকে তার আদর্শচ্যুত করায়। শশাঙ্কবাবুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ফলে বাস্তুভিটাকে আঁকড়ে ধরে দেশের বাড়ির স্মৃতিকে বজায় রেখে বাঁচতে চাওয়া মানুষটি পুনরায় বাস্তুহারা হওয়ার দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু বিতানের উদ্যোগে বসতবাড়িটি অক্ষত রাখার বন্দোবস্ত হয়। বিতানের পূর্ব-প্রেমিকা রুবি পুকুর আর বাগানটি কেনার বন্দোবস্ত করে একরকম বিপদ থেকে উদ্ধারই করে। কিন্তু এর আগেই শশাঙ্কবাবু ঘটিয়ে ফেলেন চরম দুর্ঘটনা। গ্লানিবোধ তাঁকে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে দেয়। তবে ঘটনাক্রমে শেষ মুহূর্তে শশাঙ্কবাবু রেললাইন থেকে মাথাটা সরিয়ে নিলেও ডান হাত তাকে হারাতে হয়। জমির পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে গেলে পুকুর জমি প্লট করে বিক্রি করে মেটালে তবেই সম্ভব। তাই শশাঙ্কবাবুর প্রশ্ন জাগে — *"তাইলে কি আবার বাস্তুচ্যুত।"*[২১]

উপন্যাসের প্রথমে যে স্বপ্ন নির্মাণের কাহিনি ঔপন্যাসিক দিয়েছিলেন উপন্যাসের শেষে সে স্বপ্ন ভাঙনের কাহিনি উল্লিখিত হয়েছে। বাস্তুভূমির রূপ বিবর্তিত হয় বহু কারণে। সেই চিত্রই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় এঁকেছেন শশাঙ্ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তিনি স্বপ্নের বাস্তু নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। রুবি শশাঙ্কবাবুর নির্মিত 'দেশের বাড়ির আদল' না নষ্ট করলেও

মালিকানা যে আর শশাঙ্কবাবুর রইল না। এই ভাবনা এখন শশাঙ্কবাবুর শেষ জীবনের সম্বল। আসলে তিনিও তো চ্যুত হলেন স্বভূমি থেকে। একদিকে সন্তানদের কাছে তিনি পূর্ব মর্যাদা আর ফিরে পাবেন না। অন্যদিকে স্বপ্নের বাস্তুভিটাটিও তাঁর হাতছাড়া হল। এদুয়ের মাঝে জীবন সম্পর্কে জটিল জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হন তিনি। তাই প্রাণে বেঁচে বাড়ি ফিরে এসেও শশাঙ্কবাবু এখন জীবনের শেষ সম্বল থেকে বিচ্যুত। তাই বিকারহীন শশাঙ্কবাবুর অনুভূতি ঠিক এরকম—

> *"শশাঙ্ক ফিরেছে বাড়িতে। ডানহাত ব্যাণ্ডেজ মুক্ত। কনুইয়ের তলায় পোড়া বেগুনের মত মাংসপিণ্ডে চামড়ার আস্তরণ পড়েছে। শশাঙ্ককে সব বলেছে বিতান। বলেছে সব রয়ে যাবে। ওঁর নিজ হাতে রোপন করা গাছ, পুকুর সবই। শুধু দলিলের নামটাই পাল্টে যাবে, আর কিছু নয়। শশাঙ্ক এখন জড়পদার্থ। হ্যাঁ-না কিছুই বলেন না। শুধু চোখটা বড় বেশি বেঁচে আছে। অবিরল জল পড়ে।"*[২২]

উপন্যাসে বিতানের স্ত্রী বনানীর জীবন জিজ্ঞাসা প্রথম থেকেই সংকটাপন্ন। তাকে বিনা পণে বিয়ে করে এনেছে বিতান। তাই শ্বশুর আর স্বামীর কাছে নতমস্তকে সে দিন যাপন করে চলেছে। তবে শ্বশুরটি তার অন্য মানুষ। দেওর ননদের চাইতে শ্বশুরের সঙ্গেই তার সময় কাটে বেশি। শ্বশুরের আত্মজীবনী লেখার নির্দেশে তাকেও মাঝে মাঝে কলম ধরতে হয়। ফলে শ্বশুরের সেবা যত্নই শুধু মন দিয়ে করা নয়, শ্বশুরের মনের কথাটিও ধৈর্য সহকারে শুনতে হয়। ভালোই লাগে বনানীর। শ্বশুর যখন স্বপ্নের বাগানটির গাছপালার রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তখন বনানীর সামনে অনেক অজানা তথ্যের উদ্ঘাটন হয়। সেকেলে মানুষ হলেও শ্বশুরের আচরণ অনেকটাই আধুনিক মনস্ক। ফলে বনানীর সঙ্গে শ্বশুর শশাঙ্কবাবুর হৃদ্যতার সম্পর্কই গড়ে ওঠে। কিন্তু বিতান তার স্বামী। বিতানের আধুনিক মন কি বনানীকে বন্ধুত্বের আহ্বান জানিয়েছে? না বনানী স্বামীর কাছে কোনো দিনই যোগ্য সম্মান পায়নি। চার মাসের বিবাহিত জীবনে বারবার অপমানিত হতে হয়েছে তাকে। বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়িতে এসে শ্বশুর ব্যতীত বিতান, বাদল বা ননদ টুম্পা কারুর কাছেই বনানী যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তবে এমন নয় যে কর্তব্যে বনানী কখনো পিছপা হয়েছে। তবুও তাকে নিত্য হীনমন্যতাবোধের শিকার হতে হয়। স্বামী তার বড়ো চাকরিজীবী, 'প্রগ্রেসিভ মাইন্ডেড' মানুষ। তাই বনানী সাহিত্যের ছাত্রী হয়েও সিলেবাসের বাইরে সাহিত্যপাঠ করেনি জেনে বিতান কটুকথা বলতে পিছপা হয়নি। বিয়ের পর হানিমুনে না গেলেও একবার অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল বিতান। সেখানেই প্রথম বিতানের চেয়ে বনানীর উদার

মানবিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে—

> *"ঐ যে, কেঁক নামে ছেলেটা, ওদের গ্রামে গেলাম আমরা, ওর বোনের বিয়ে, তুমি বিয়ের গান রেকর্ড করলে, শীতকাল, বাচ্চাগুলোর গায়ে জামা পর্যন্ত নেই। একটা বুড়ি, কেঁক-এর ঠাকুমা বোধহয়, একটা চটের বস্তা মুড়ি দিয়েছিল। আমি আমার শালটা খুলে চুপিচুপি রেখে এসেছিলাম, তোমায় বলিনি।"*[২৩]

বনানীর উদারতার পরিচয় বিতানের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। বিতানের নতুন করে বাঁচতে চাওয়ার ইচ্ছে জেগে ওঠে। পৃথিবীটা ততটাও মন্দ মনে হয় না তার কাছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় বিতান কোনো দিনই রুবির কথা বনানীকে জানায়নি। পুরনো বাক্স ঘাটতে গিয়ে বিতানকে পাঠানো রুবির চিঠি পেয়ে যায় বনানী। তাদের প্রেমালাপের মুহূর্তগুলো বনানীর সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বনানী সবটা জেনেও বিতানকে কিছুই জানায় না। কারণ তার বিনম্র স্বভাবই সে কাজ করতে বাধা দেয়। সংসার ধর্মের প্রতিটি কর্তব্যই সে পালন করে চলে অবিচল ভাবে। প্রতিমুহূর্তে রুবির প্রেমালাপের বাক্য কানে বাজলেও নিজের অন্তরেই তার সীমাকে আবদ্ধ করে রাখা সে রপ্ত করে ফেলে। কারণ স্বামী হিসেবে বিতান অনেক সময়ই তাকে জীবনের কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গী করে। ফলে নিজের মতো করে জীবনের বহু ক্ষেত্রকে বনানী সাজিয়ে নিতে শুরু করে। কিন্তু শ্বশুর শশাঙ্কবাবু জীবনের বাঁক বদলের সম্মুখীন করালেন। তাতে বনানীর বাস্তুজমির ভিতও আলগা হওয়ার ভিত্তিপূজা হল। শ্বশুর মশাইয়ের যে চিত্র বনানীর মনে আঁকা ছিল সেখান থেকে যেন ছিটকে যেতে গিয়েও পারেনি। আত্মজীবনী লেখার ভারটাতো বনানীরই হাতে। ফলে তাকেই লিখতে হল শ্বশুর মহাশয় কতটা টাকা বিয়ে বাবদ খরচ করেছেন এবং বিয়েতে পণ না নেওয়ার কারণ। বনানী নিজেকেই অপরাধী ভাবতে থাকে। উপরন্তু শ্বশুরের অ্যাক্সিডেন্টের জন্য দুই ননদের বক্তব্য নারী হিসেবে বনানীর মনে গভীর প্রভাব ফেলে—

> *"... শম্পা আর টুম্পা দুই বোন ঠিক করেছে জ্যোতিষীর কাছে যাবে। নতুন বৌ-এর নির্ঘাত কিছু দোষ আছে। নইলে ও আসার পরই বাড়িতে একটার পর একটা ...।"*[২৪]

বিয়ের পর বনানীর পায়ের নীচের বাস্তুভূমিটি শক্ত হতে না হতেই শ্বশুর বাড়িতে যে বিপর্যয় নেমে আসে তাতে বনানীর মনেও গ্লানিবোধের জন্ম দেয়। বিতানের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি একথা ঠিক। কিন্তু সে সবকিছুর মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করলেও নিয়তির করুণ চক্ষু যেন তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বিতানের জীবনে দীর্ঘদিন পরে

রুবির আবির্ভাব। রুবির সঙ্গে আলাপ। রুবির স্বামীর অর্থপ্রাচুর্যের সঙ্গে পরিচয়। সবটা মিলিয়ে বনানীর মনের কোণে সংশয় সৃষ্টি হয়। সেই সংশয় অহেতুক নয়। বিতানের বিপদের দিনে রুবির দ্বারাই তাদের বাগান আর পুকুরটিকে বাঁচানোর বন্দোবস্ত হয়। ফলে রুবির অবাধ বিচরণ শুরু হবে বনানীদের বাড়িতে। এই সত্যটা অনুমান করে বনানী। কিন্তু তার করার কিছুই নেই।

আসলে বনানীও বাস্তুচ্যুত হয়। শুধু এক রকমভাবেই মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় না। যেমনভাবে শশাঙ্কবাবু হয়েছেন। মানুষ বহুবিচিত্র পরিস্থিতিতে মনোভূমি থেকেও বাস্তুচ্যুত হয়ে যায়। বনানীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাকেও তার জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিল রুবি। শশাঙ্কবাবু তা বুঝতে পেরেছিলেন। বিতানের জীবনে রুবি আবার জায়গা করে নেবে সেদিকেই পদচারণা শুরু হয় দুজনের। ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষটি অনুভব করে অন্য মানুষটির উচ্ছেদ হওয়ার দৃশ্যটি। তাই কনুইয়ের তলার বিক্ষত মাংসকুণ্ডলি কথা বলে ওঠে— *'তুই এখন কী করবি বনানী? বনানী লো...।'*[২৫]

উপন্যাসের মধ্যে বিতানের জীবন-বীক্ষা অন্যমাত্রা যোগ করে। তাকে বাস্তুহারা হতে হয় না কোনোভাবেই। তবে পিতার আদর্শকে নিয়ে তার মধ্যে গর্ববোধ ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে পিতা শশাঙ্ক যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তাতে বিতানের মূল্যবোধে সজোরে কুঠারাঘাত হানে। পিতার প্রতি বিতানের শ্রদ্ধাবোধের জাগরণ আর হয় না। তবে প্রতিনিয়ত জমির পাওনাদারদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করতে সে পিছ্‌পা হয় না। অবশ্য পিতা শশাঙ্কের করুণ অবস্থা এবং বিতানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাও অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিতানের চরিত্রের কয়েকটি দিক রয়েছে। সে আদর্শবান পিতার পুত্র, বনানীর স্বামী (বিনা পণে বিয়ে করেছে), রুবির প্রেমিক, আবহাওয়া দপ্তরের সচেতন কর্মী। পিতা শশাঙ্কবাবুর বিতানকে নিয়ে তেমন অভিযোগ নেই। তিনি যেভাবে বিতানকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত। দেখা যাক বনানীর জীবনের দিক থেকে। স্বামী হিসেবে বিতান নিজেকে বনানীর তুলনায় উঁচু দরের মনে করে। তার বোধ, বুদ্ধি সমস্ত কিছুই বনানীর তুলনায় অধিক। বনানীর বাবার কাছ থেকে সামান্যতম পণের দাবীও সে করেনি। উপরন্তু তার মধ্যে সাহিত্যবোধের উচ্চ রুচি রয়েছে; যা সাহিত্যের ছাত্রী হয়েও বনানীর মধ্যে নেই। বিয়ের বাসর ঘরে বনানীকে বিতানের প্রশ্ন থেকেই বিষটি স্পষ্ট হয়—

> *"বিয়ের পর যখন বাসরঘরে গেছে, বিতানের প্রথম কথাটাই ছিল এম.এ.-র স্পেশাল কি ছিল? বনানী বলেছিল উপন্যাস ও ছোটগল্প। বিতান বলেছিল, কমলকুমার মজুমদার কেমন লাগে? বনানী বলেছিল, কমলকুমার? মানে ...*

বিতান তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, ঠিক আছে, বুঝে নিয়েছি।''[২৬]

ঘটনাক্রমে পিতা শশাঙ্ককে এবং তার স্বপ্নের বাস্তুভিটাকে রক্ষা করতে উপায় বের করতে গিয়ে রুবির সঙ্গে পুনরায় বহুদিন পর সাক্ষাৎ হয়। আবহাওয়া দপ্তরের কাজটি থেকে সে সাসপেন্ড হয় বাড়ির সমস্যা নিয়ে মানসিক দোলাচলতার কারণেই। কিন্তু বনানী বা অন্য কাউকে সে কথা জানাতে পারেনি। তার গাফিলতির জন্যই প্লেন ক্র্যাশ হয়। প্রাণ সংশয় হয় বহুজনের। সমস্ত কিছুর যুপকাষ্ঠে বিতানের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। উপরন্তু শশাঙ্কবাবুর হাত কাটা যাওয়ার ঘটনা তাকে আরো মর্মাহত করে তোলে। এসবের মাঝে রুবির সঙ্গে দেখা হওয়া অনেকটা হঠাৎ আলোর ঝলকানি। রুবির সঙ্গে সংসার জীবন গড়ে ওঠেনি তার নিজের জন্যেই। কিন্তু রুবির বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তাকে নিয়ে ভাবনার জগতে ক্ষণিকের ছায়াপাত হলেও পুনরায় সাক্ষাৎ তার পূর্বমূর্তিকে জাগিয়ে তোলে। ঘটনাসূত্রে রুবির সঙ্গে আলাপের মধ্যেই বিতান জানতে পারে রুবির জীবনের অপূর্ণতার কথা। স্বামীটি তার শিল্পপতি। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি মনোনিবেশ না করে বহু নারীসঙ্গই তার কাম্য। ফলে রুবির জীবনের নিঃসঙ্গতা বিতানকে ভাবায়। একাকী জীবন কাটাতে চায় রুবি। তাই বিতানের জীবনের বিপর্যয়ের কথা জানতে পেরে বিতানের জমিটি কিনতে রাজী করিয়ে নেয় রুবি তার স্বামীকে। ফলে বিতানের জীবনে পুনরায় রুবির প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হল। কিন্তু বনানীর মনোভূমির কথা বিতানের মনে নেই। সবার আড়ালে স্ত্রী বনানীর উচ্ছেদ বিতানের নজরে এলো না, বা সে অনুভব করার চেষ্টা করল না। ফলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া বিতানের অনুভূতির জায়গা যে বড়োই কম তা পাঠকের সামনে ধরা পড়তে দেরি হয় না।

রুবির ভূমিকা উপন্যাসের পরিণতিকে সত্যিই তাৎপর্যবহ করে তোলে। রুবি বিতানের এক সময়ের প্রেমিকা; যাকে বিতান বিয়ে করতে পারেনি। সেই রুবির বিয়ে হয় শিল্পপতি পাত্রের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহিত জীবনটি তার সুখের হয়ে ওঠে না। স্বামীর বহু নারীসঙ্গের পরিচয় পেয়ে কিছু বলার উপায় থাকে না রুবির। কারণ স্বামীটি তার নিজের মতো জীবন কাটাতে চায়। রুবিও নিজের মতো কাটাক তাতে তার কোনো আপত্তি নেই। আসলে রুবির জীবনে জৌলুসতা, বিলাসিতার কোনো অভাব নেই, শুধু অভাব ভালোবাসার। সে নিজের সম্পর্কে বলেছে— *"জমি নেই। আমি উদ্বাস্তু। শরণার্থী।''*[২৭] আসলে জীবনে প্রতিটি মানুষেরই কোথাও না কোথাও অপূর্ণতা রয়ে যায়। রুবির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জীবনের এক পর্বের ভালোবাসা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর তার বিবাহিত জীবনেও সে শরণার্থীর মতোই রয়েছে। কিন্তু বিতানের সঙ্গে দেখা হওয়া তার জীবনের টার্ণিং পয়েন্ট। আর বিতানের দুরবস্থা তার হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার সূত্র। ফলে

রুবি যে কীভাবে বিতান-বনানীর মাঝখানের দেওয়াল হয়ে উঠেছে তা উপলব্ধির জায়গায় সে পৌঁছাতে পারে না। তার কাছে নিজের জমি ফিরে পাওয়াই মূল উদ্দেশ্য। ফলে উপন্যাস মধ্যে মূলত শশাঙ্কবাবু আর বনানীই ভূমিহীন, বাস্তুহীন সত্তা। পার্থক্য শুধু পরিসরের।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মধ্যে বাদল, টুম্পা, শম্পা চরিত্রকে সামান্য কয়েকটি ঘটনায় সামনে এনেছেন। কিন্তু উপন্যাসের গতিপথে তাদের ভূমিকা সেভাবে প্রভাব ফেলেনি। জমির ব্রোকার এবং পাওনাদার সূত্রে যে চরিত্রের উপস্থাপন করা হয়েছে তাদের জীবন-বীক্ষার পরিচয় সেভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু 'বাস্তুকথা' উপন্যাসে বাস্তুভূমির ইতিবৃত্ত রচনার সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক যেভাবে তার দ্বৈতরূপকে তুলে ধরেছেন তা ভাবনার অবকাশ রাখে। এক শরণার্থীর বাস্তুভূমির কথা বলতে গিয়ে এক নারীর বাস্তুভূমির কথাও উঠে এসেছে। তার বাস্তুচ্যুত হওয়ার ভাষাকে ঔপন্যাসিক যে ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন তা সত্যিই শিল্পমণ্ডিত রূপের অধিকারী। জীবন যে আসলে কী? জীবনের মূল্যবোধের ধরন যে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তা 'বাস্তুকথা' উপন্যাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ। শশাঙ্কবাবু বাস্তু উচ্ছেদের কাহিনি তার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিলেন। যে ইতিহাস কারুর জানা নেই সে ইতিহাস তিনি জানিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সময় এবং পরিস্থিতি তাকে সেই পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাস্তুহারা জীবনের পরিণতিকে নিজের হাতে সাজিয়ে তুলেছিলেন শশাঙ্কবাবু। সময় পরিবর্তনে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন। পরিবারকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে পুত্রবধূ বনানীকে। বনানী আর শশাঙ্কবাবু দু'জনেই বাস্তুহারা। একজন বাস্তুভূমির স্বপ্ন থেকে আর একজন জীবনভূমি থেকে। তাদের জীবন জিজ্ঞাসা একই স্বরে কথা বলেছে। মানুষকে কতরকমভাবে বাস্তুহারা হতে হয় সেই জিজ্ঞাসা উপন্যাসের মূল সুরকে চিহ্নিত করে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী আমাদের সামনে মানব জীবনের বহু বিচিত্র অলিগলিকে তুলে ধরেন। সময়ের চালচিত্র যেখানে স্পষ্ট ভাবে ধরা দেয়। নব্বইয়ের দশকে লেখা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তী ফেলে আসা উদ্বাস্তু জীবনের কথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি তুলে ধরেছেন সমকালের জীবন-চর্যার মানসিকতার পরিবর্তনকে।

নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত উপন্যাস তিনটির মধ্যে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মূল অন্বেষণ মানব চরিত্রের কয়েকটি পর্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি সময়বীক্ষণের লেখক। সমকালের প্রেক্ষিতে লেখা শুরু করে তিনি ফিরে যান অতীত ইতিহাসে। 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাস রচনায় নব্বই নয় উঠে এলো ষাট-সত্তর দশক। অনুভব করলেন টিকে থাকার লড়াইয়ে মানুষের বৃত্তিবদল ঘটানোর মধ্যে দিয়েই অভিযোজন করতে হয়। 'নবম পর্ব' উপন্যাসে উঠে এল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষগুলোর

টিকে থাকার লড়াইয়ের ব্যর্থ প্রয়াসের চিত্র। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা কীভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-চর্যায় নিজের আধিপত্য বিস্তার করে তার চিত্র। পলিটিক্স আর যন্ত্র বিজ্ঞানের স্রোত কী সাধারণ মানুষকে ডাকিনি প্রমাণ করে নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তার করতে থাকবে?— এই জিজ্ঞাসা 'নবম পর্ব' উপন্যাসের অন্বেষণ। বাঙালি নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে অক্ষম। তাই দেবতার মন্দিরে সিনেমার গান মাইকে বাজে, সীতাবিনজি গ্রামের রামায়ণের মিথ ফিরে আসে তার ধ্বংসলীলার নবরূপে। ভোগবাদী মানসিকতা কীভাবে মানব-জীবনের স্বাভাবিকত্বকে নষ্ট করে তার চিত্র এই উপন্যাসে রয়েছে। 'বাস্তুকথা' উপন্যাসের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের দোলাচলতার ছবি রয়েছে। বাস্তুভূমি থেকে বিচ্যুত হওয়া বা মনোভূমি থেকে বিচ্যুত হওয়া একই সীমারেখায় উপস্থিত হয়। আধুনিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মানুষ হওয়ার লক্ষে মানবিক সম্পর্কগুলো আলগা হতে থাকে। তারই চিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর আখ্যানে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভিন্ন প্রেক্ষাপটকে বেছে নিয়ে মানব-চরিত্রের ভিন্ন সংকট, ভিন্ন ভাবনার উত্তরণ, তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলিতে জায়গা করে নিয়েছে। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষকে টিকে থাকতে হয়। তাই প্রতিমুহূর্ত তার সামনে উপস্থিত হয় নতুন পরিস্থিতি। স্বপ্নময় চক্রবর্তী সৃষ্ট চরিত্রগুলি সে যাত্রায় নিজস্ব স্বরকে খুঁজতে বের হয় এবং আবিষ্কার করে ভিন্ন আত্মজিজ্ঞাসা, ভিন্ন আত্মবিশ্লেষণ।

বিশ শতকের নব্বই-এর দশক অর্থাৎ বিশ শতকের সমাপ্তি পর্বে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বিষয়ভাবনা যে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে এগিয়েছে সে বিষয়গুলিকে বিশ্লেণ করা হয়েছে। এবার এক নতুন শতক তথা একুশ শতকের দিকে এগিয়ে আরও কতরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন তার রূপ অঙ্কণে মনোনিবেশ করেছেন ঔপন্যাসিক। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সেই উপন্যাসগুলির আলোচনায় রত হব।

তথ্যসূত্র:

১. 'চতুষ্পাঠী', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৪১।

২. তদেব, পৃ. ৪৪।

৩. তদেব, পৃ. ৭৩।

৪. তদেব, পৃ. ৭৭।

৫. তদেব, পৃ. ৭৭-৭৮।

৬. তদেব, পৃ. ১১৪।

৭. তদেব, পৃ. ১১৬।

৮. তদেব, পৃ. ১১৮।

৯. তদেব, পৃ. ১১৮।

১০. তদেব, পৃ. ১২০।

১১. তদেব, পৃ. ১২৮।

১২. তদেব, পৃ. ১৫৮।

১৩. তদেব, পৃ. ১৫৯-১৬০।

১৪. তদেব, পৃ. ১৬০।

১৫. তদেব, পৃ. ১৬০।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৩।

১৭. তদেব, পৃ. ৯৩।

১৮. 'নবম পর্ব', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৯।

১৯. তদেব, পৃ. ১৮।

২০. তদেব, পৃ. ৯১-৯২।

২১. 'বাস্তুকথা', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১১০।

২২. তদেব, পৃ. ১২৬।

২৩. তদেব, পৃ. ১০২।

২৪. তদেব, পৃ. ১১৩।

২৫. তদেব, পৃ. ১২৭।

২৬. তদেব, পৃ. ১৩।

২৭. তদেব, পৃ. ১২১।